ফেব্রুয়ারি ২০২০ ▪ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের প্রাক্কালে

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

একুশ: অবিনাশী আলোকবর্তিকার নাম

জনশক্তি রপ্তানি খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

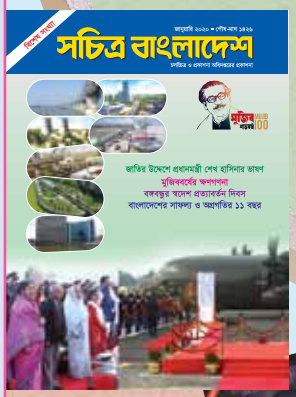

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

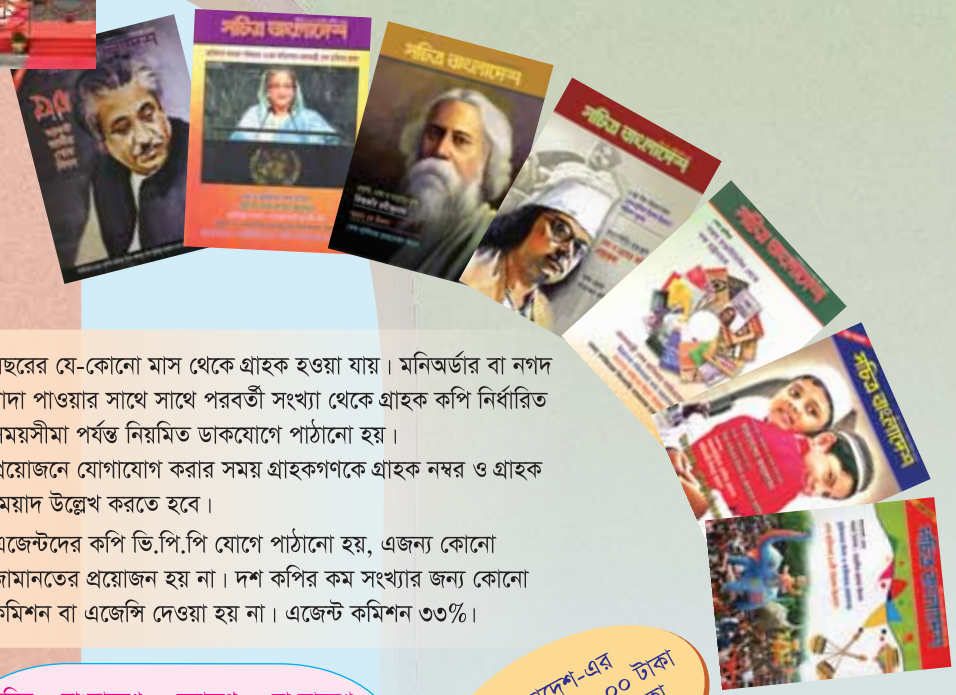

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২০ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৬

মোদের গরব, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভাস্কর্য

সম্পাদকীয়

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ও অর্জনের গৌরবে চিরভাস্বর হয়ে আছে একুশ। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও একুশের পথ ধরেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়েছে আমাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি। বর্তমান বিশ্বে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষীরাও পেয়েছে তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। ২০০০ সাল থেকে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পালিত হয়ে আসছে। আমরা প্রত্যাশা করছি অমর একুশের চেতনায় আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরো সমৃদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ১৭ই মার্চে শুরু হবে। বাংলাদেশের স্থপতির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে এবারের সংখ্যায় রয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নানা বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এবারের সংখ্যাটি। এ সংখ্যায় থাকছে একুশের কবিতা, গল্প, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ ও নিয়মিত প্রতিবেদন।

আশা করছি, এবারের সংখ্যাটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া
সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
মহাঃ শামসুজ্জামান

কপি রাইটার
মিতা খান
সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ
শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা
আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

মুজিববর্ষের প্রাক্কালে ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

একুশ: অবিনাশী আলোকবর্তিকার নাম ৬
রফিকুর রশীদ

জনশক্তি রপ্তানি খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ৮
এম এ খালেক

ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ১০
মাহবুব রেজা

বাংলা ভাষাপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু ১২
আতিক আজিজ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ১৫
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

হৃদয়জুড়ে মায়ের ভাষা ১৭
লিলি হক

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু ১৮
পাশা মোস্তফা কামাল

বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধার সুকর্ণ ২১
বিনয় দত্ত

ভাষা আন্দোলনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৫
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

মুজিববর্ষে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ২৭
আজহার মাহমুদ

গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের ৮ ধাপ অগ্রগতি ২৮
শুক্লা সরকার

ভাষার মুক্তি ও আমাদের চেতনা ২৯
রহিমা আক্তার মৌ

করোনা ভাইরাস: আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সচেতনতা ৩৭
আহনাফ হোসেন

সচেতনতায় শিশু ক্যানসার ভালো হয় ৩৮
জুয়েল মোমিন

শীতার্ত নারী-শিশুসহ আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াই ৩৯
ফারিহা হোসেন

হাইলাইটস

গল্প

একটি অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ ৩৩
শামস সাইদ

কবিতাগুচ্ছ ২৩, ২৪, ৩২, ৪০, ৪১
শাফিকুর রাহী, সুজন হাজারী, খান চমন-ই-এলাহি দেলওয়ার বিন রশিদ, আবুল হোসেন আজাদ, রুস্তম আলী নজমুল হেলাল, ফরিদ আহমেদ হৃদয়, হাসান হাফিজ বাতেন বাহার, মিয়াজান কবির, বাবুল তালুকদার শাহনাজ, ওয়াসীম হক, মুসলিমা খাতুন (শান্তি) ছাদির হুসাইন ছাদি, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, সাদিয়া সিমরান রাবেয়া নূর, ফাহ্‌মিদাতুন্নেছা, দেলোয়ার হোসেন মাইন উদ্দিন আহমেদ, রফিক হাসান, সাজিদ হোসেন তাহমিনা বেগম, শাহ্ সোহাগ ফকির

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪২
প্রধানমন্ত্রী ৪৩
তথ্যমন্ত্রী ৪৪
জাতীয় ঘটনা ৪৫
আন্তর্জাতিক ৪৭
উন্নয়ন ৪৮
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৪৯
শিক্ষা ৪৯
শিল্প-বাণিজ্য ৫১
বিনিয়োগ ৫১
নারী ৫২
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
কৃষি ৫৪
কর্মসংস্থান ৫৪
বিদ্যুৎ ৫৫
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
যোগাযোগ ৫৭
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
মাদক প্রতিরোধ ৫৮
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
ক্রীড়া ৬২
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন ভাষা সৈনিক চিকিৎসক এম এ হামিদ খান ৬৪

মুজিববর্ষের প্রাক্কালে

মহাকালের মহাপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ মুজিববর্ষ ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে শুরু এবং শেষ হবে ১৭ই মার্চ ২০২১ সালে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাণপুরুষ। বাঙালির হাজার বছরের নিপীড়নের নিগড় ভেঙে তিনি উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন দেশ। ইতিহাসের এ বরপুত্র প্রান্তিক অঞ্চলে জন্ম নিয়ে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতিসত্তার স্বাধীন স্বরাজ এনে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাই এই স্বপ্নপুরুষ মহান মানুষটির জন্মশতবর্ষের নামকরণ করা হয়েছে 'মুজিববর্ষ'। মুজিববর্ষ মানে আনন্দ হর্ষের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই উপলক্ষে দেশে-বিদেশে গ্রহণ করা হয়েছে বর্ণিল কর্মসূচি। এ বিষয়ে 'মুজিববর্ষের প্রাক্কালে' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি

বাঙালি জাতির সংগ্রামমুখর ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন অত্যুজ্জ্বল এক গৌরবময় অধ্যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ যে অর্জন মহান স্বাধীনতা, তার বীজও উপ্ত ছিল এই একুশের চেতনার মধ্যেই। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পরও বাঙালি জাতিকে বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করতে হয়েছে। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ইতিহাসের নানান বাঁক বদল ঘটেছে; আমাদের সেই সব ক্রান্তিকালেও একুশের প্রদীপ্ত শিক্ষা অমানিশার ঘোর কাটিয়ে পথের দিশা দিয়েছে। তাই বলা চলে, মহান একুশের কাছে আমাদের ঋণের কোনো পরিসীমা নেই। অমর একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বিষয়ে 'একুশ: অবিনাশী আলোকবর্তিকার নাম' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৬। এছাড়া ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে রয়েছে– ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা ভাষাপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু এবং ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শীর্ষক নিবন্ধ/প্রবন্ধসমূহ দেখুন, পৃষ্ঠা-১০, ১২ ও ১৮

জনশক্তি রপ্তানি খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরেও উচ্চমাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, এ বছর বিশ্বে যে তিনটি দেশ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে একটি। অন্য একটি সংস্থা বলেছে, এ বছর বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হচ্ছে। এই উন্নয়নে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি বাবদ ১ হাজার ৬৪২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছিল। এটা ছিল কোনো একক বছরে সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিটেন্স আয়। এ বিষয়ে প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৮

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

মুজিববর্ষের প্রাক্কালে

খালেক বিন জয়েনউদদীন

মহাকালের মহাপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের নির্ধারিত দিনক্ষণ আসন্ন। আগামী মাসের ১৭ই মার্চ থেকেই জন্মশত বছর শুরু হবে এবং শেষ হবে ১৭ই মার্চ ২০২১ সালে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন শত বছর পূর্বে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার জলে ডোবা বিলঝিল ও বাঁওড়ে ঘেরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। সেই গ্রাম এখন তীর্থভূমি। পাতা-পল্লবে ঢাকা সেই গ্রামেই মা-বাবার কবরের পাশে শুয়ে আছেন জাতির পিতা।

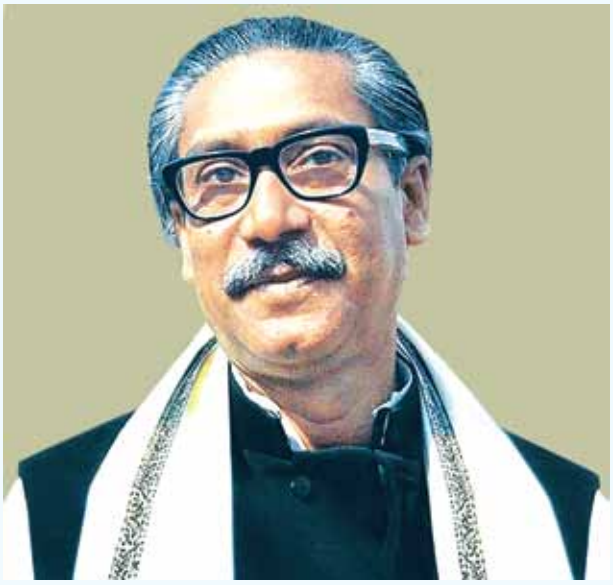

একশ বছর মানে একশ শতাব্দী। শেখ মুজিব তাই বিংশ শতাব্দীর প্রাণপুরুষ। উপমহাদেশের এই ভূখণ্ডের মুক্তিদাতা। বাঙালির হাজার বছরের নিপীড়নের নিগড় ভেঙে তিনি উপহার দিয়েছেন একটি দেশ ও একটি স্বাধীনসত্তা। শতবর্ষের আলোয় তিনি মধ্যগগনের সূর্যরাজ। সূর্যরাজের আলোয় উদ্ভাসিত আজ বাঙালির ঘর, গেরস্থ, মাঠ-প্রান্তর এবং সকল চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন। আমাদের পরম গৌরব ও অহংকারের বিষয় এই স্বপ্নপুরুষ মহান মানুষটির জন্মশতবর্ষ পালন করছি এবং আমাদের বর্ষপঞ্জির দিনক্ষণের সময়টুকুর নাম দিয়েছি 'মুজিববর্ষ'। মুজিববর্ষ মানে আনন্দ হর্ষের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। মুজিববর্ষ মানে স্মৃতি স্মরণের কালজয়ী বছর। তিনি ইতিহাসের বরপুত্র। প্রান্তিক অঞ্চলে জন্ম নিয়ে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতিসত্তার স্বাধীন স্বরাজ এনে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

গত একশ বছরের ইতিহাসের যেসকল ঘটনা এ অঞ্চল কিংবা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে, সেসব ঘটনার কোনো না কোনোটিতে সরাসরি অংশীদার মুজিব। তাঁর জীবন কেটেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল, ব্রিটেনের রানির আমল ও পাকিস্তানি আমলে। রানির আমলে তিনি কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে সরাসরি অংশ নিয়েছেন বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়ে। উপমহাদেশ বিভক্তির অনেক আগেই ১৯৪২ সালে কলকাতা যান পড়াশোনা করার জন্য। ভর্তি হন ইসলামিয়া কলেজে। তখন ব্রিটিশদের তাড়ানোর আন্দোলন চলছে। মুজিব তখন একজন রাজনৈতিক কর্মী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দিল– তারা উপমহাদেশ ছেড়ে যাবে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মতদ্বৈততা, দাঙ্গা এবং জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের কারণে সেই স্বাধীনতা খণ্ডিত হলো। বাংলার একটি অংশের মায়া ত্যাগ করে পূর্ব বাংলার মুসলিমরা সেই খণ্ডিত স্বাধীনতা মেনে নিল। মুজিবও বাপদাদাদের কথার বরখেলাপ করলেন না। যুবক মুজিব ও ছাত্র মুজিব সেই আন্দোলনে ছিলেন লড়াকু সৈনিক। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক গুরুরা এই খণ্ডিত পাকিস্তানি স্বাধীনতা মেনে নেননি। একবছর যেতে না যেতেই মুজিবের পাকিস্তানি মোহ দূর হলো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে।

এখন ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি চলছে। ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের জাগৃতি। এই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। যারা পাকিস্তানি স্বাধীনতা চাইল তারা বলল, নতুন রাষ্ট্রের রাজভাষা হবে উর্দু। অথচ বাঙালিরা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভাষার ওপর পাকিস্তানি প্রথম আগ্রাসনরোধে এগিয়ে এলেন পূর্ব বাংলার মানুষ। ভাষা আন্দোলনের এই উন্মেষপর্বে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম ও শেখ মুজিব রুখে দাঁড়ালেন। খাজা নাজিমুদ্দীন, জিন্নাহর ঘোষণায় ভাষা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল, পাকিস্তানি স্বাধীনতার লগ্নে, যার প্রথম স্ফূরণ ঘটল ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ। ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের নেতৃবৃন্দ রাস্তায় নামলেন। ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হলো। যার নেতৃত্ব দিলেন শেখ মুজিব, খালেক নওয়াজ, বখতিয়ার এমএ ওয়াদুদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত মিয়া, শামসুল হক, অলি আহাদ প্রমুখ তরুণ রাজনৈতিক কর্মী। তাঁরা ওইদিন আহত হয়ে জেলে গেলেন।

তখন নাজিমুদ্দীন সরকার ক্ষমতায়। সরকারের এই অত্যাচারে প্রতিবাদের শামিল হলেন– শেরেবাংলা, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ড. মালেক, সবুর খান, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ। নাজিমুদ্দীন অবস্থা বেগতিক দেখে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিলেন এবং বললেন উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হবে। আর কেন্দ্রে তিনি এর জন্য সুপারিশ করবেন। কিন্তু তার কথা কার্যকর হয়নি। জিন্নাহর উর্দু ঘোষণায় পূর্ব বাংলার মানুষ আবার জেগে উঠল। শুরু হলো আবার আন্দোলন, যার চূড়ান্ত পরিণতি বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরে ভাষাভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, যার মহানায়ক শেখ মুজিব।

এরপর চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, বাঙালির প্রথম বিজয়। প্রদেশে শেরেবাংলা, আবু হোসেন ও আতাউর রহমান খানের গঠিত সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারল না, থাকতে দেওয়া হলো না। কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থাও তাই। শুরু হলো উভয় অংশে পাকিস্তানি জেনারেলদের শাসন ব্যবস্থা। ইস্কান্দার মির্জার পরে এল আইয়ুব খান। সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের শোষণ। বাঙালিদের অর্থে গড়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে তিনটি রাজধানী– করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদ। সবকিছু লুটে নিল তারা। শেখ মুজিব রুখে দাঁড়ালেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে জনগণকে জাগালেন। '৬৬ তে ফেডারেল ব্যবস্থার জন্য ৬ দফা দাবি উত্থাপণ করলেন। তাঁকে বলা হলো পাকিস্তান ভাঙার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। লোকটি ভারতের দালাল। একসময় তাঁকে জেলে নেওয়া হলো অন্যদের সাথে। তারপরের ইতিহাস জাগানিয়া। সমগ্র বাংলাদেশ আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করল। মুজিব মুক্তি পেলেন সঙ্গী- সাথিদের নিয়ে। আইয়ুবের বিদায়, এল আরেক নরখাদক জেনারেল ইয়াহিয়া খান। লোকটি নির্বাচন দিলেন ঠিকই, কিন্তু বিজিত বাঙালিদের ক্ষমতা না দিয়ে বাঙালি নিধনে মত্ত হলো। আর আমাদের শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ। একাত্তরের সেই ছাব্বিশে মার্চ পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হবার আগে স্বাধীনতার ঘোষণাটিও দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। নয়টি মাস যুদ্ধ হলো। ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেল। আমরা মিত্রবাহিনীর সহায়তায় বিজয়ী হলাম। বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন সগৌরবে।

৭ই মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

এরপর বঙ্গবন্ধুর বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার পালা, বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করা। মিত্রবাহিনীকে স্বদেশে পাঠানো ও ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের চুক্তি। মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, কলকারখানা সরকারিকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ, জমির সিলিং নির্ধারণসহ প্রভূত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন এবং শাসন ব্যবস্থা তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সর্বদলীয় প্লাটফর্ম বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ গঠন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে এসব কাজ তিনি সম্পাদন করেন এবং বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন।

কিন্তু একথা দিবালোকের মতো সত্যি তাঁর একাত্তর থেকেই শত্রুর অভাব ছিল না। স্বাধীনতাবিরোধীরা ছিল তক্কে তক্কে। দেশের ভেতরে ও বাইরে ছিল একাত্তরের শত্রু ও ষড়যন্ত্রকারীরা। আর পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তো ছিলই। সময় ও সুযোগ বুঝে এসব চক্র গভীর ষড়যন্ত্র করে কিছু বিপদগামী সেনা ও তাঁর দলের মীরজাফর খোনকারের সহায়তায় ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে প্রাণ সংহার করে। হত্যা করে তাঁর নিকট আত্মীয় ও মোহাম্মদপুরের বস্তি ঘরের মানুষজনকে। ক্ষমতা দখল করে ওই খোনকার। জেলখানায় ওরা বঙ্গবন্ধুর প্রিয়ভাজন ও মুজিবনগর সরকারের জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে। পরবর্তীকালে খুনিদের নির্দেশদাতা জিয়া, একপর্যায়ে এরশাদ ও খালেদা ক্ষমতায় আসে। তারা একুশ বছর অবৈধভাবে দেশ চালায়। এসময় বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর দল ও তাঁর সহচরেরা ছিল নিষিদ্ধ।

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের আগে বঙ্গবন্ধুর দুইকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। আওয়ামী লীগের তখন দুঃসময় ও নিষিদ্ধকাল। একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা ক্ষমতায়। বলা যায় বাংলাদেশকে হাফ পাকিস্তানে পরিণত করেছিল তারা। স্বাধীনতাকামী মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার ছিল না। সেই দুঃসময়ে খুনিদের ভয়ডর উপেক্ষা করে একাশিতে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। কিন্তু ১৯৯৬ সালের পূর্বে কোনো সময়ই তিনি নিরাপদ ছিলেন না। বার বার তাঁকে এবং তাঁর দলের লোকজনদের হত্যার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। অবশেষে অবরুদ্ধ গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে শেখ হাসিনার নিরলস পরিশ্রম ও আন্দোলনের ফলে ১৯৯৬ সালে। দীর্ঘ একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধুর দল ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের পাকিস্তানি অবয়ব টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে। মাঝে সূক্ষ্ম ভোট কারচুপি করে স্বাধীনতাবিরোধীরা শেষবারের মতো ক্ষমতা দখল করে। তাদের ক্ষমতার পাঁচ বছর অতিবাহিত হবার পর থেকে অদ্যাবধি বঙ্গবন্ধুর দল দেশ শাসন করছে। ইতোমধ্যে তাঁর যোগ্যকন্যার বদৌলতে বঙ্গবন্ধুর খুনি ও একাত্তরের খুনিদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। আর বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির কথা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এখন মহাকাশে। বাংলাদেশের মানুষ সুখে আছে। কোনো অভাব- দৈন্য নেই। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় এমন স্বপ্নই দেখেছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন শেখ হাসিনা। তাঁর সহায় পরম বিধাতা ও দেশের আপামর সাধারণ মানুষ।

বাংলাদেশের এই সুসময়ে মহাকালের মহামানব বাঙালির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ গৌরব ও অহংকারের বার্তা নিয়ে আসছে। আমরা তাঁর ডাকে মরণপণ লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলাম। আবার তাঁরই জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবন ও আদর্শের কথা স্মরণ করছি। আমাদের উত্তরসূরিরা জানতে পারছেন– পূর্ববাংলার আকাশে শত বছর আগে উদয় হয়েছিল এক মহামানবের। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন–

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্কা
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। মুজিববর্ষ সফল হোক। মুজিব চিরস্মরণীয় থাকুক জন্ম জন্মান্তরে। জয় বাংলা।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

প্রবন্ধ

একুশ: অবিনাশী আলোকবর্তিকার নাম

রফিকুর রশীদ

বাঙালি জাতির সংগ্রামমুখর ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন অত্যুজ্জ্বল এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের এই ভূখণ্ডে ঘটে যাওয়া এ অন্দোলনের শোকাবহ এবং বহু দ্যোতনাব্যঞ্জক পরিণতির কথা আমরা বছরের এই বিশেষ দিনে স্মরণ করি, শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন অথবা মিঠেকড়া শীতার্ত সকালে পুষ্পমাল্য হাতে প্রভাতফেরি করে শহিদমিনারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি; এমনই সব আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব কর্মকাণ্ডের ফ্রেমে বন্দি করে অমর

মিছিলের আগে ছাত্র জমায়েত, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

একুশকে আমরা জাতীয়ভাবে স্মরণীয় একটি দিবসে পরিণত করেছি। একুশ আমাদের দিয়েছে অনেক। বাঙালির জাতীয় চেতনা সুসংহত করা, বাঙালি সংস্কৃতির স্বকীয়তা শনাক্ত করা, সর্বোপরি বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে কৌতূহলী করে তোলা– এসবই তো একুশের কাছ থেকে পাওয়া। এমনকি এ বিষয়েও কোনো ধরনের বিতর্কের অবকাশ নেই যে, বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ যে অর্জন মহান স্বাধীনতা, তার বীজও উপ্ত ছিল এই একুশের চেতনার মধ্যেই। ১৯৭১-এ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পরও এ জাতিকে বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করতে হয়েছে, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ইতিহাসের নানান বাঁক বদল ঘটেছে; আমাদের সেই সব ক্রান্তিকালেও একুশের প্রদীপ্ত শিক্ষা অমানিশার ঘোর কাটিয়ে পথের দিশা দিয়েছে। তাই বলা চলে, মহান একুশের কাছে আমাদের ঋণের কোনো পরিসীমা নেই। এই ঋণ কোথায়? কেন? কী রকম? জাতীয় এই ঋণের সঙ্গে ব্যক্তি আমার কী সম্পর্ক? সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আমরা ঋণ পরিশোধের দায় অনুভব করব কেমন করে? এই দায়বোধ না থাকলে ঋণ পরিশোধে ব্রতী হব কী উপায়ে? এ যেন অনেকটা বাতাসের মধ্যে বাস করে বাতাসের অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়ার মতো ঘটনা। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়! বাতাসের কাছে ঋণের কথা ভুলে গিয়ে বেঁচে থাকা যেমন অসম্ভবপ্রায় ঘটনা, আমাদের জাতীয় জীবনে একুশের উপস্থিতির অপরিহার্যতাও তেমনি অনিবার্য ঘটনা।

এ কথা আজ দিবালোকের মতোই পরিষ্কার বাঙালি জাতির কাছে একুশ কেবল একটি গাণিতিক সংখ্যামাত্র নয়, অথবা ক্যালেন্ডারের পাতায় লালকালিতে চিহ্নিত একটি তারিখ মাত্র নয়। একুশের তেজদীপ্ত প্রাখর্য স্বাধীনতাকামী শান্তিপ্রিয় মৃত্তিকালগ্ন একটি জাতির সারা শরীরে পরিব্যাপ্ত। বিস্মরণের দোলায় এ শরীর হয়ত সাময়িকভাবে দুলে উঠতে পারে, কিন্তু একুশের চেতনা এতটাই অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যই বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য এবং বাঙালি জাতির জাগৃতির জন্য অনেক কিছুই করেছেন তাঁরা। কিন্তু এই উন্নতি-সমৃদ্ধি-জাগৃতির প্রকৃত চাবিকাঠির সমাধান পাননি; কারণ অমল ধবল সেই চাবি লুকানো ছিল একুশের সিন্দুকে। কোথায় ১৯৫২-এর একুশ (ফেব্রুয়ারি), আর কোথায় বা তাদের সময়কাল! তবে হ্যাঁ, বাহান্নতে যারা সেই হিরণ্ময় চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছেন তাদের সঙ্গে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষের গৌরবদীপ্ত কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই, এমন কিন্তু নয়। সাদা চোখে সেই সম্পর্কের অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। তাদের রচিত পটভূমি বা পাটাতনে দাঁড়িয়েই বাহান্নতে বীর বাঙালি পাহাড়চূড়া স্পর্শ করেছে। চর্যাপদের অন্যতম পদকর্তা ভুসুকুপা, যদি সেদিন ঘোষণা না করতেন 'আজি হতে তু বাঙালি ভইলি,' কবি আবদুল হাকিম যদি মধ্যযুগে চিৎকার করে না বলতেন– 'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি,' মাইকেল মধুসূদন যদি উনিশ শতকেই উপলব্ধি না করতেন– 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,' তাহলে বিশ শতকের মাঝামাঝি কালে এসে ভাষা আন্দোলন এমন প্রাণশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠত না এবং একটি পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামকে এমন বেগবান করে একেবারে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিতে পারত না। সেই বিবেচনায় বাঙালি জাতির হাজার বছরের সংগ্রামমুখর ইতিহাসে বিগত শতকের একুশের ভাষা আন্দোলনের অবস্থান একেবারেই অনন্য, অতুলনীয়। মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে এমন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ অবস্থান গ্রহণ পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালি ভিন্ন আর কোনো জাতিই বা করেছে!

একুশের মর্মমূলে ছিল ভাষার প্রশ্ন এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত জাতীয়তাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্নটি-এ নিয়ে নিশ্চয় বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। ভাষার প্রশ্ন, মানে কোন সে ভাষা? অবশ্যই সেটা মাতৃভাষা। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো মানুষের কাছে আদিম ভাষা হচ্ছে তার মাতৃভাষা। কথা বলা, স্বপ্ন দেখা, চিন্তা করা, লেখাপড়া করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, অফিস-আদালতের কাজকর্ম থেকে শুরু করে জীবনযাপনের জন্য সবকিছুই মাতৃভাষায় সম্পাদনের অধিকার যে-কোনো মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন, তাই ভাষা আন্দোলন। সে দিনের প্রেক্ষিত ছিল বাংলা ভাষা নিয়ে। বাঙালির মুখের ভাষা বাংলা। ভাষা শুধু নয়, বাঙালির আছে নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আচার আহার বিহার জীবনযাপন ধারা। এই সবকিছু নিয়েই সে বাঙালি; হাজার

বছরের বাঙালি। দিনে দিনে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবোধের এই পরিচয় হিমালয়স্পর্শী উচ্চতা লাভ করেছে অসংখ্য কৃতি মানুষের কর্মে ও সাধনায়। স্বাধীনভাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্মগত অধিকার কে পারে রোধ করতে? কবে কোথায় কোন দেশে ঘটেছে এমন সর্বনেশে কাণ্ড? দুর্ভাগ্য হলো এই– এমন অঘটন একদা আমাদের এই দেশেই ঘটেছে। বাঙালি জাতি বুকের রক্তে রুখে দিয়েছে সব অপচেষ্টা। নিষেধের বেড়াজাল ছিঁড়ে বাংলা ভাষা ঠিক সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বমহিমায়। এক অর্থে বাংলা ভাষা যেন বা জনমদুখিনি মেয়ে। ধনীর দুলালী তো নয়। খুব সাধারণভাবে প্রকৃতিলগ্ন সাধারণ মানুষের সুখে-দুখে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। জন্ম থেকেই অভিজাত শ্রেণি তথা রাজ-রাজন্যের কাছ থেকে বাংলা ভাষা পেয়েছে ঘৃণা আর অবজ্ঞা।

এই ভাষা ব্যবহারকারী জনসাধারণকে গৌরব নামের নরকের ভয় দেখানো হয়েছে। এছাড়াও অনেক প্রকার সামাজিক পীড়নের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে এ লড়াই করতে হয়েছে একেবারে শুরু থেকেই। সে লড়াই প্রাণসংহারী রূপ নিলে অনেক মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু মুখের ভাষা এবং সে ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চর্যাপদকে ত্যাগ করেনি। সে কারণেই বহু শতাব্দী পরে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই আদি কাব্য 'আশ্চর্য চর্যাবিনিশ্চয়' আবিষ্কার করলেন নেপাল থেকে। মধ্যযুগের গীতিকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' খুঁজে পেলেন বসন্তরঞ্জন বিদ্যাল্লভ বাঁকুড়ার এক গোয়ালঘরে। সমাজের উচ্চ শ্রেণি কৃত্রিম ভাষা সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং একইসঙ্গে অবহেলা করেছে বাংলা ভাষাকে। বাংলা তবু টিকে থেকেছে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। রাজকীয় আনুকূল্য বলতে মুসলিম শাসন আমলে বেশ খানিকটা জুটেছে। ফলে দৌলত উজির শাহ গরীবুল্লাহর মতো কবির পক্ষে বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা সম্ভব হয়েছে। তবে দালাল শ্রেণির দৌরাত্ম্য তখনো ছিল। তারাই শাসকদের মনোরঞ্জনের জন্য মুসলিম শাসনামলে যেমন রাজভাষা তুর্কী শিখেছে, তেমনি ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি শিখেছে এবং বাংলাচর্চার প্রতি ঘৃণা আর অবজ্ঞা ছুড়ে দিয়েছে। পাকিস্তানি আমলেও দালাল শ্রেণির অভাব হয়নি। তারা প্রভুতোষণের জন্য নির্লজ্জভাবে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে বাঙালির কাঁধে, বাংলা বর্ণমালা নিয়ে ষড়যন্ত্র করে আরবি হরফে বাংলা লেখার কূটযুক্তি পর্যন্ত উত্থাপন করেছে, এ দেশে রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধ এবং নজরুলচর্চাও খণ্ডিত (শুধু মুসলিম সংস্কৃতির প্রতিফলন যেটুকু সাহিত্যে পাওয়া যায়) করেছে। ধর্মকে তারা ভাষা ও সাহিত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করেছে। বাংলা ভাষা তো এই রকম প্রতিকূল পরিবেশের বৈরিতাকে অতিক্রম করেই টিকে থেকেছে, ফুল-ফল দিয়েছে, বুকভরা আবেগ দিয়েছে, লড়াইয়ের শক্তি সাহস দিয়েছে। তাই আমাদের ভাষা আন্দোলন হঠাৎ ১৯৫২ সালে শুরু হয়েছে ভাবলে খুব ভুল হবে। এ আন্দোলনের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত; এ লড়াইয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে অনেক পেছনে দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

বাঙালির ভাষার লড়াই কীভাবে কোন প্রেক্ষাপটে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তরিত হলো, ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯-এর সব স্রোত কীভাবে একাত্তরে এসে এক মোহনায় মিশে গেল, সে প্রসঙ্গে অল্প দু'একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। মুখের ভাষা বাংলা বলেই আমি বাঙালি, এই-ই আমার জাতীয় পরিচয়। বসবাস বা অবস্থানের বিচারে আমার নাগরিক পরিচয় ভিন্ন হতে পারে। নাগরিক পরিচয় কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের বদল হয় বা হতে পারে, ভাষাভিত্তিক জাতীয় পরিচয়ের কিছুতেই বদল হয় না। কাজেই ভাষা আন্দোলন করতে গিয়েই এদেশের সাধারণ মানুষ আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে: 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি।' এই বাঙালি হওয়ার জন্যেই চর্যাপদের কাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চরম মূল্য দিতে হয়েছে। রক্তে ধোয়া সংবিধানে তাই আমাদের জাতীয়তা লেখা হয়েছে বাঙালি। বাঙালি হওয়ার নয়, বাঙালি পরিচয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার এই গণ-আকাঙ্ক্ষা থেকেই তো রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের অংশগ্রহণ।

সেই গোড়া থেকেই ধর্ম এসে বাঙালিত্বের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দুর ব্রাহ্মণ্যবাদই হোক আর কট্টর মুসলমানের মোল্লাতন্ত্রই হোক, বাংলা চর্চার পথে কাঁটা বিঁছিয়েছে তারা উভয়েই। ধর্মের জিগির তুলে বাঙালিত্বের অসাম্প্রদায়িক বিকাশ বার বার বিঘ্নসংকুল করা হয়েছে অতীতে। তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বাঙালি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কাজেই গণ-আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতেই পারে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শের প্রতি। বিশেষত পাকিস্তানি শাসকদের (ধর্ম পরিচয়ে তারাও মুসলমান) বিদ্বেষ ও বৈষম্যপূর্ণ শাসন ও নির্যাতনে ক্ষুব্ধ বাঙালি মুসলমানেরাও 'মুসলিম-মুসলিম ভাই ভাই'-এই ধোঁকাপূর্ণ তত্ত্বে আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপ্ন বুকে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ করে। ভাষা আন্দোলনই বাঙালিকে ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, তারপর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা রাষ্ট্রীয় সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হঠাৎ সেই ধর্মনিরপেক্ষতা যদি সংবিধান থেকে বিসর্জিত হয় তাহলে তো মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলন দুটোকেই পরিহাস করা হয়।

শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বসবাসের সুবাদে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হতে হতে আপামর জনসাধারণ তো শোষণমুক্ত শ্রেণি-নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেই পারে। ভাষার লড়াই করতে গিয়েই এদেশের সাধারণ মানুষ টের পেয়েছে শ্রেণি-বিদ্বেষের বিষবাষ্প কতটা ভয়াবহ হতে পারে। কাজেই সেই শিক্ষা থেকে তারা অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের অবসানের আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের স্তম্ভকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখে আশ্বস্ত বোধ করেছে।

পঁচাত্তরের পরে কূটকৌশলে সেই স্তম্ভ সরিয়ে নিয়ে শ্রেণি-নিরপেক্ষ শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্নকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো বটেই, ভাষা আন্দোলনের মূল স্পিরিটও অনেকাংশে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এত সব নেতির মধ্যেও ইতিবাচক দিক হচ্ছে, আমরা ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছি। ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা এখন পৃথিবীতে চতুর্থ অবস্থানের ভাষা। বাংলা ভাষী যত মানুষ বাংলাদেশে বাস করে, প্রায় তার সমপরিমাণ মানুষ বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে বাস করে; তারা বাংলায় কথা বলে, গান গায়, স্বপ্ন দেখে, সাহিত্যচর্চা করে; তবু তারা বাংলাদেশের বাঙালিদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না কিছুতেই। তাদের হাতের মুঠোয় নেই ২১শে ফেব্রুয়ারি, নেই ২৬শে মার্চ, নেই ১৬ই ডিসেম্বর। শুধু এই তিনটি তারিখের তাৎপর্য নিয়ে বাংলাদেশে যে পরিমাণ শিল্পসাহিত্য রচিত হয়েছে, বাংলাদেশের বাইরের বাঙালিরা কোথায় পাবে এই আবেগ, এই উত্তাপ! তাকে তো দুর্ভাগ্য বলতেই হয়– বাঙালি হয়েও বাংলার ভাষা আন্দোলন এবং বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত সাহিত্য, চিত্রকলা, নাট্যকলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে ওঠা যার হলো না। কিছু কিছু আত্মসচেতন ভারতীয় বাঙালি লেখককে এদেশে বেড়াতে এসে এই নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা গেছে। তাই তো বলি, ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। এ দুটোই অমিত সম্ভাবনাময় ইতিবাচকতার অফুরন্ত খনি। পথের বাঁকে ঝড়-ঝাপটা আগেও এসেছে, আমরা ভেঙে পড়িনি, পথ হারাইনি; ঘনঘোর অন্ধকারেও একুশ আমাদের পথের দিশা দিয়েছে; আগামীতেও এই অবিনাশী আলোকবর্তিকা যে-কোনো দৈব দুর্বিপাকে সামনে চলার পথ দেখাবে; পায়ের তলে শক্ত মাটি এবং মাথার ওপরে উদার আকাশ দিবে।

লেখক: সাহিত্যিক ও অধ্যাপক, গাংনী ডিগ্রি কলেজ, মেহেরপুর

নিবন্ধ

জনশক্তি রপ্তানি খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি

এম এ খালেক

চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য-বিরোধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশকেই প্রভাবিত করেছে। বিশ্বব্যাপী চলতি পঞ্জিকা বছরে অর্থনীতির অধিকাংশ সূচকই কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতঃপূর্বে বৈশ্বিক জিডিপি (গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট) প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করা হয়েছিল প্রকৃত অর্জন তার চেয়েও কম হতে পারে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবি'র মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো বলছে, এ বছর বিশ্ব জিডিপি প্রবৃদ্ধি আগেকার ধারণার চেয়েও এক থেকে দেড় শতাংশ কম হতে পারে। অবশ্য

হাসোজ্জ্বল অভিবাসন প্রত্যাশী

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে যে প্রাক্কলন প্রদর্শন করেছে তা ইতিবাচকই বলতে হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের টার্গেটকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত করলেও তারা একটি ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছে যে, বাংলাদেশ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরেও উচ্চমাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, এ বছর বিশ্বে যে তিনটি দেশ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে একটি। অন্য দুটি দেশ আফ্রিকার। অন্য একটি সংস্থা বলেছে, এ বছর বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরেই চীন এবং ভারতের মতো দেশের চেয়ে উচ্চ মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে বিশ্ব এখন একটি 'গ্লোবাল ভিলেজে' পরিণত হয়েছে। বিশ্বের কোথাও কিছু ঘটলে তার নেতিবাচক বা ইতিবাচক প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে অন্য দেশের ওপরও পতিত হয়। কাজেই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশকেও কম-বেশি প্রভাবিত করবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের সেজন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার যে-কোনো প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি যাতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য নানা প্রতিকারমূলক বা পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে। এর সুফল আমরা ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম কোনোভাবেই যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় প্রবাসী আয়ের ওপর ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণের উদ্যোগের বিষয়টি। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কখনোই প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের ওপর কোনো ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকারই প্রথম এমন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত আয়ের ওপর নগদ সহায়তা দিলে তার ফলাফল কেমন হতে পারে–এটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশিরভাগ সূচক কিছুটা মন্থর হয়ে পড়লেও জনশক্তি রপ্তানি খাতের আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রবৃদ্ধি অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে উচ্চ মাত্রায় রয়েছে।

গত অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি বাবদ এক হাজার ৬৪২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছিল। এটা ছিল কোনো একক বছরে সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিটেন্স আয়। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ এক হাজার ৪৯৪ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছিল জনশক্তি রপ্তানি খাত থেকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানি খাত থেকে আয় হয়েছিল এক হাজার ২৭৬ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলার। এ বছর বিশ্বের অনেক দেশের জনশক্তি রপ্তানি বাবদ আয় হ্রাস পেলেও বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য প্রদর্শন করে চলেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি খাত থেকে আয় করেছে ৯৪০ কোটি ৩৪ লাখ মার্কিন ডলার। অর্থনীতিবিদগণ মনে করছেন, জনশক্তি রপ্তানি আয় এভাবে উচ্চমাত্রায় বহাল থাকলে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রায় আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার আয় করতে পারবে। কারণ আগামীতে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উদযাপিত হবে। দুই ঈদের আগে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্থানীয় বেনিফিসিয়ারিদের নিকট অধিক মাত্রায় রেমিটেন্স পাঠিয়ে থাকেন। গত ৬ মাসে বাংলাদেশ যে ৯৪০ কোটি ৩৪ লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আহরণ করেছে তারমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি মুসলিম দেশ থেকেই এসেছে ৫৪৪ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ৪৬ হাজার কোটি টাকা বা মোট রেমিটেন্সের ৫৮ শতাংশ। প্রবাসী বাংলাদেশিরা যেসব দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রেমিটেন্স প্রেরণ করেছে তারমধ্যে রয়েছে সৌদি আরব ১৯৫ দশমিক ৪২ কোটি মার্কিন ডলার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ১৩৩ দশমিক ৮৭ কোটি মার্কিন ডলার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১০ দশমিক ১৬ কোটি মার্কিন ডলার, যুক্তরাজ্য ৭৩ দশমিক ৫৮ কোটি মার্কিন ডলার, মালয়েশিয়া ৬৪ দশমিক ৩১ কোটি মার্কিন ডলার এবং ওমান ৬২ দশমিক ৭১ কোটি মার্কিন ডলার।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজমান থাকার ফলে বিভিন্ন দেশে অভিবাসনবিরোধী মনোভাব ক্রমশ চাঙা হচ্ছে। সম্প্রতি হংকংয়ের অভিবাসনবিরোধী আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য হচ্ছে, অভিবাসীদের কারণে তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রায় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তারা অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বদ্ধপরিকর। সৌদি আরবসহ মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক অবস্থায় টানাপোড়েন চলছে। তারা বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ফেরত পাঠাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি মূলত জ্বালানি তেলনির্ভর। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যাপকভাবে উঠানামা করার কারণে এসব দেশের অর্থনীতি কিছুটা হলেও মন্থর হয়ে পড়েছে। বিদেশি শ্রমিকের চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৮০ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক অবৈধ হয়ে পড়েছেন। এছাড়া কুয়েতে ৫ হাজার, ইরানে দেড় হাজার, মিশরে ৪ হাজার এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় আড়াই হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক অবৈধ হয়ে পড়েছেন। সৌদি আরব থেকে অনেকেই ফেরত আসছেন। তবে সৌদি আরব সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌদি আরবের 'স্পেশাল এক্সিট প্রোগ্রামে'র আওতায় অবৈধ বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হবে। পরবর্তীতে তারা আবার সৌদি আরব যেতে পারবেন। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে অবৈধভাবে সৌদি আরবে অবস্থানরত ৬ লাখ অবৈধ বাংলাদেশি বৈধতা অর্জনের জন্য আবেদন করে। এদের মধ্যে ৪ লাখ শ্রমিক বৈধতা পেয়েছেন। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেসব খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে জনশক্তি রপ্তানি খাত তারমধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে উচ্চ মাত্রায় ফরেন রিজার্ভ বিল্ড-আপের ক্ষেত্রে জনশক্তি রপ্তানি খাতের কোনো বিকল্প নেই। বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাতের অবদান এখনো সবার শীর্ষে। কিন্তু এক অর্থে বা তুলনামূলক বিচারে জনশক্তি রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক খাতের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। তৈরি পোশাক খাত থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তারমধ্যে ৬৪ থেকে ৬৫ শতাংশ জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। অবশিষ্ট ৩৪ থেকে ৩৫ শতাংশ অর্থ শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল এবং ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি বাবদ পুনরায় দেশের বাইরে চলে যায়। এছাড়া তৈরি পোশাক শিল্পে শীর্ষ পর্যায়ের টেকনিশিয়ানদের বেশিরভাগই ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের। তারা আমাদের দেশ থেকে উচ্চ বেতন-ভাতা নিয়ে যাচ্ছেন। এক হিসাব অনুযায়ী দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শীর্ষ পর্যায়ে কর্মরতা বিদেশি টেকনিশিয়ানদের পেছনে প্রতিবছর প্রায় ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে। অন্যদিকে জনশক্তি রপ্তানি খাতের জন্য কোনো কাঁচামাল অথবা ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি করতে হয় না। ফলে এই খাতে যে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তার প্রায় শতভাগই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ খাত বিশাল অবদান রাখছে।

বর্তমানে ১ কোটিরও বেশি বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান করছে। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির ইতিহাস খুব একটা পুরনো নয়। মূলত বিগত শতকের সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ব্যাপকভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৬ সালে মাত্র ৬ হাজার ৮৭ জন বাংলাদেশি কর্মসংস্থান উপলক্ষে বিদেশি গমন করেছিলেন। এখন প্রতিবছর গড়ে ৭ থেকে ৮ লাখ বাংলাদেশি কর্মসংস্থান উপলক্ষে বিদেশে গমন করেন। কয়েক বছর আগের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের জিডিপিতে ১১ দশমিক ১৪ শতাংশ অবদান রাখছে। এছাড়া মোট রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এই খাতের অবদান ৫৩ দশমিক ৫০ শতাংশ। ২০০৫ সালে জনশক্তি রপ্তানি খাত জিডিপি'তে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ অবদান রাখত। বর্তমান সরকারের আমলে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এই খাতের অবদান দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি খাতের অবদান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ দশ রেমিটেন্স আহরণকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জনশক্তি রপ্তানি বেশিরভাগই ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফলে বিদেশগামীদের অনেকেরই নানাভাবে প্রতারিত হতে হয়। অতিরিক্ত অর্থগ্রহণের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো, সঠিক পন্থা অবলম্বন না করে বিদেশে প্রেরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণ ইত্যাদি নানা কারণে শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে সমস্যায় পতিত হন। সরকার রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণা রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে সমস্যা কিছুটা হলেও কমে এসেছে। এছাড়া জি-টু-জি (গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট) পদ্ধতিতে জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে যারা কর্মসংস্থান উপলক্ষে বিদেশে গমন করেন তাদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের সদস্য। ফলে তাদেরকে বিদেশে গমনের খরচ বহন করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। বিদেশ গমনেচ্ছুকদের অর্থায়নের সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করেছে সরকার। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপিত হওয়ার ফলে এখান থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিদেশ গমন করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে যান, তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ ও অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক। তারা বিদেশি ভাষা জানেন না। ফলে অভিবাসনের পর তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না। অথচ উন্নত দেশ এমনকি ভারতের মতো দেশও পেশাজীবী এবং দক্ষ শ্রমিক বিদেশি পাঠিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি রেমিটেন্স আয় করছে। বাংলাদেশি একজন শ্রমিক বিদেশে কর্মসংস্থান করে বছরে গড়ে এক হাজার ৬৭২ মার্কিন ডলার দেশে প্রেরণ করতে পারেন। অথচ ভারতের প্রতিজন অভিবাসী বছরে গড়ে ৬ হাজার ১১২ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেন। চীনের ক্ষেত্রে এটা ৪ হাজার ৮৪৩ মার্কিন ডলার। বেলজিয়ামের একজন অভিবাসী প্রতিবছর গড়ে ২৩ হাজার মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করে। বাংলাদেশ থেকে যদি উচ্চ প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনবল রপ্তানি করা যেত, তাহলে এই খাতের আয় আরো অনেক বাড়ানো সম্ভব। সরকার এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই জনশক্তি উন্নয়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতের আর একটি বিশেষ সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে স্বল্প সংখ্যক দেশের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাত মূলত মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি মুসলিম দেশের ওপর নির্ভর করে টিকে আছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজারে জনশক্তি রপ্তানির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সরকার ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তির কর্মদক্ষতা বাড়ানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে আগামীতে রেমিটেন্স আয় আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে–এটা নিশ্চিত করেই বলা যেতে পারে।

লেখক: জি এম (অব.), বিডিবিএল ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক

ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান

মাহবুব রেজা

'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'– অতুলপ্রসাদ সেনের এই কথা প্রতিটি বাঙালিরই মনের কথা। মা, মাটি আর মুখের বোল– এই তিনে মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। নিজের ভাষার চেয়ে মধুর আর কিছু হতে পারে না। বাঙালি বাহান্ন সালে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল তার মুখের ভাষাকে। মায়ের ভাষাকে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার অধিকারকে বুকের রক্ত দিয়ে আপন করে নেওয়ার রেকর্ড শুধু বাঙালিরই। রফিক, সালাম, বরকত, শফিউরসহ নাম না জানা অসংখ্য শহিদের রক্তস্নাত এই অর্জনই বিশ্বে বাঙালিকে অমর করে রেখেছে। যতদিন লাল-সবুজের পতাকা খচিত এই বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, বঙ্গবন্ধু থাকবে। ততদিন পৃথিবীর বুকে বাংলা ভাষা আপন মহিমায় চির জাগরুক থাকবে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: প্রভাতফেরিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদান রয়েছে। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন সক্রিয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। এ সময় নবগঠিত দুটি প্রদেশের মধ্যে পূর্ব বাংলার প্রতি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ভাষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করলে বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হকের বক্তব্য ও গ্রন্থে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা যায়। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক বলেন, 'সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করে তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক'। (সূত্র: গাজীউল হক, *ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা*, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনীকার অধ্যাপক ড. মাযহারুল ইসলাম এ বিষয়ে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান এই মজলিসকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহুকাজে সাহায্য ও সমর্থন করেন' (সূত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মাযহারুল ইসলাম, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ পৃ. ১০৪)। বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বাংলা ভাষার দাবির সপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন মিটিং-মিছিল হয়। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে তিনি অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদান করেন। ভাষা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবি সংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইশতাহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইশতাহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। ইশতাহারটি একটি ছোটো পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল– যার নাম 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইশতাহার ঐতিহাসিক দলিল'। উক্ত পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই ইশতাহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন এর অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির তিন-চার মাসের মধ্যেই পুস্তিকাটির প্রকাশনা ও প্রচার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের জন্য পাকিস্তান নামের স্বপ্ন সম্পৃক্ত মোহভঙ্গের সূচনার প্রমাণ বহন করে। পুস্তিকাটি যাদের নামে প্রচারিত হয়েছিল তারা সবাই অতীতে ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। উল্লেখ্য, এদেরই একজন ছিলেন ফরিদপুরের (বর্তমান গোপালগঞ্জ) শেখ মুজিবুর পরবর্তীকালে যিনি বঙ্গবন্ধু হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।'

ছাত্র রাজনীতির শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দূরদর্শিতা আর সাহসিকতা তাঁকে ভিন্ন এক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য দিন। এদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। এই ধর্মঘট ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বঙ্গে পালিত হওয়া প্রথম সফল ধর্মঘট। এতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু পুলিশ নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেফতার হন। ভাষা সৈনিক অলি আহাদ

তাঁর *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫* গ্রন্থে লিখেছেন– 'আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ থেকে ১০ই মার্চ ঢাকায় আসেন। ১১ই মার্চের হরতাল কর্মসূচিতে যুবক মুজিব এতটাই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, এ হরতাল ও কর্মসূচি তার জীবনের গতিধারা নতুনভাবে প্রবাহিত করে'। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি* শীর্ষকগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– 'স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই বঙ্গবন্ধুর প্রথম গ্রেফতার। সেদিন ধর্মঘট সফল করতে ১লা মার্চ, ১৯৪৮ প্রচার মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম (তমদ্দুন মজলিস সম্পাদক), শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য), নঈমুদ্দীন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক) এবং আবদুর রহমান চৌধুরী (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা)। জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিবৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট বলে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ১১ই মার্চের গুরুত্ব এবং গ্রেফতার প্রসঙ্গে পরবর্তীতেই বঙ্গবন্ধু বলেছেন 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নয়, মূলত শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ (*দৈনিক আজাদ*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। সেদিনই সকাল ৯ ঘটিকার সময় আমি গ্রেফতার হই। আমার সহকর্মীদেরও গ্রেফতার করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর সঙ্গে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার এ দেশবাসীর কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল।

রাজনৈতিক চড়াই-উতরাইয়ে বঙ্গবন্ধুকে দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্তপর্বে বঙ্গবন্ধুকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কারাগারে থাকতে হয়েছিল। এসময় বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকলেও সেখানে বসেই তিনি ভাষা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। (ড. মোহাম্মদ হাননান, *একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক*, পৃ. ৫৩)। এ প্রসঙ্গে ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন'। (গাজীউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা*, পৃ. ৪০)।

বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যেমন– তাজউদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ আলী, আবদুল মতিন, শামসুল হক, অলি আহাদ, আব্দুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, আব্দুল মুমিন তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এবং পরে হাসপাতালে থাকাকালীন আন্দোলন সম্পর্কে চিরকুটের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাতেন। ভাষাসংগ্রামী প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী 'একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন– 'শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ১৯৪৯ সালে দুবার গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের পর জেল থেকে ছাড়া পান।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থা নিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। সোহরাওয়ার্দী এই অবস্থানে দৃঢ় থাকলে ভাষা আন্দোলনে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারত (ড. মোহাম্মদ হাননান, *একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক*, পৃ. ৫৩)। শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এই মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছর জুন মাসে আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচি যাই এবং তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি' (বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬)। বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ ও অসীম রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন। ওই বিবৃতিটি ১৯৫২ সালের ২৯শে জুন ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় মওলানা ভাসানীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে ভাসানী বলেন, বাংলা ভাষার পক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পরিবর্তনে মুজিব সক্ষম না হলে শুধু ভাষা আন্দোলন নয় আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। বঙ্গবন্ধুর মতো দূরদর্শী নেতার পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। বাংলা ভাষা এবং আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর এই অবদান চির স্মরণীয় থাকবে।

১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালের আইন পরিষদে অধিবেশনে সংসদের কার্যসূচি বাংলায় লিপিবদ্ধ করার আহ্বান জানান। একই বছরের ১৬ই ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি বলেন, 'আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস, আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু হবে'। ১৯৭২ সালে দেশের প্রথম সংবিধান রচনা করা হয়। এই সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে তিনি বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি ওই বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, 'মাননীয় সভাপতি, আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগিদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন'। পৃথিবীর দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের স্বদেশের ভাষাপ্রীতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দিত করেছেন। এর বহু আগেও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন। ১৯৫২ সালে চীনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে তিনি বাংলায় বক্তব্য রাখেন।

১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ অফিস-আদালতে বাংলা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার বাস্তবায়ন চাইতেন। বাংলা, বাঙালি আর বাংলাদেশ– এই তিন ছিল বঙ্গবন্ধুর চির আরাধ্য। তিনি তাঁর পুরোটা জীবনজুড়ে কাজে-কর্মে, চিন্তাভাবনায় এর প্রমাণ রেখে গেছেন। বিশ্বের বুকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পেয়ে বাংলা ভাষাকে প্রথমবারের মতো মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন আর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষাকে এক গৌরবের আসনে বসিয়ে দেন।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বাংলা ভাষাপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু

আতিক আজিজ

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ– একটি অপরটির সঙ্গে এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, একটিকে ছেড়ে অন্যটি কল্পনাতে আসে না। একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জড়িত। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত দীর্ঘ, বলা যেতে পারে এটি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই বিশাল প্রেক্ষাপটে ততোধিক বিশালত্ব নিয়ে বিরাজিত একটি নাম– শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের আগেই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের শাসকদের স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকে এবং একইসঙ্গে এ অঞ্চলের তখনকার যুব সমাজ নিজেদের অধিকার রক্ষার চিন্তা করতে শুরু করে। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের একটি কক্ষে। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন– কাজী ইদ্রিস, শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাজশাহীর আতাউর রহমান, আখলাকুর রহমান আরও কয়েকজন। আলোচ্য বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের যুবসমাজের করণীয়? এর কয়েকদিন আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক নিবন্ধে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আজাদে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ড. জিয়াউদ্দিনের উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপরীতে তিনি প্রস্তাব দিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের যদি একটি রাষ্ট্রভাষা হয় তবে গণতন্ত্রসম্মতভাবে শতকরা ৫৬ জনের ভাষা বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। একাধিক রাষ্ট্রভাষা হলে উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তখনকার প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার ধারক যুব সম্প্রদায়কে। এরই ফলে সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের বৈঠকটি আয়োজিত হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের অসাম্প্রদায়িক যুব সম্প্রদায়ের সম্মেলন ডাকতে হবে। বৈঠকের নেতৃবৃন্দ ঢাকা পৌঁছালেন, ঢাকার ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের ৬-৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হলো।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাড়িতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কারণ এই সম্মেলনে বাধার সৃষ্টি করেছিল খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার এবং তার অনুগ্রহপুষ্ট গুন্ডারা। ৭ই সেপ্টেম্বর সম্মেলনে জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ'। সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন–

পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক'। এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। উচ্চারিত হয়েছিল নিজের মাতৃভাষায় বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকারের দাবি। জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবি।

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে ভাষার যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তা সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথমভাগে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব করলে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে ধিক্কার দিলেন লিয়াকত আলি খান। তিনি এবং রাজা গজনফর আলী খান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা ব্যক্ত করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দিন এবং তমিজউদ্দিন খান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন। নাজিমুদ্দিন বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চায়।

ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ১১ই মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ১০ই মার্চে রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি সভা বসল। সভায় আপোশকামীদের ষড়যন্ত্র শুরু হলো। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়কসহ অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে, আপোশ করতে চাইছে সরকারের সঙ্গে। একটি বজ্রকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠল 'সরকার কি আপোশের প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে দিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তবে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে।' ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোগলটুলীর শওকত শামসুল হক। আপোশকামীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল। এ সম্পর্কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে অলি আহাদ বলেছিলেন– 'সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন তাহলে ১১ই মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না'। ১১ই মার্চে হরতাল হয়েছিল, পিকেটিং হয়েছিল সেক্রেটারিয়েটের সামনে, সেখান থেকে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁর অপর সাথি অলি আহাদ, শামসুল হক এবং অন্যান্যদের সঙ্গে।

১১ই মার্চের আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা পূর্ব পাকিস্তানে। বেগতিক দেখে খাজা নাজিমুদ্দিন আপোশের কথা তুললেন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ৮ দফা সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় যেহেতু বঙ্গবন্ধুসহ ভাষা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ ছিলেন, সেহেতু চুক্তির খসড়া কারাগার নিয়ে গিয়ে তাতে তাঁদের সকলের সম্মতি নেওয়া হয়। শর্তানুসারে ১৫ই মার্চ নেতৃবর্গ মুক্তি পেলেন। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন পুলিশি জুলুম ও সরকারের গণবিরোধী ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা তাদের দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। মুজিব জনতার মনের কথাটি ধরতে পারলেন। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতার সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভার সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সভা শেষে সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করতে তিনি ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা ঘেরাও করেছিলেন। সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ হয়েছিল, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছিল। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেদিন সংগ্রামী ছাত্র সমাজ সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ভাষা শহিদ বরকতের সমাধিতে প্রার্থনারত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তমদ্দুন মজলিস ও তার মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক বাংলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র (সরকারি) ভাষা করার পক্ষে এবং ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু একইসঙ্গে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদও আঁকড়ে ধরেছে। তাই ডক্টর শহীদুল্লাহর বক্তব্যকে তারা তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে। যেমন ৯ই জানুয়ারি সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকায় আকালী চৌধুরী লিখলেন–

মূল সভাপতি পণ্ডিত-প্রবর শহীদুল্লাহ সাহেব তো তবু নূতন কথা কিছু আমাদের জানিয়েছেন। মুসলমানের চেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালি, প্রকৃতি মা যেন আমাদের চেহারায় ছাপ মেরে দিয়েছেন। টিকি টুপিতে আমাদের পরখ করবে কি করে। নতুন কথাই বটে। মি. জিন্নাহ আর তার চেলা-ফেলাদের এই এতদিনকার পুরানো দুই জাতিত্বের রক্তক্ষয়ী চিৎকারের পর এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরও মুসলমানের চাইতে আমাদের বাঙালি পরিচয়টাই খাঁটি সত্য-এর চেয়ে অভিনব কথা আর কি হতে পারে? পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান পুরোহিতের যোগ্য কথাই বটে।

মুজিব যখন কারাগারে তখন ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল। মিছিল করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল শত সহস্র ছাত্র-জনতা। মিছিল শেষে বেলতলায় জমা হয়েছে সবাই পরবর্তী ঘোষণার জন্যে। শামসুল হক চৌধুরী, গোলাম মওলা, আব্দুস সামাদ আজাদ-এর মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছেন শেখ মুজিব– খবর পাঠিয়েছেন তিনি সমর্থন জানিয়েছেন একুশের দেশব্যাপী হরতালের প্রতি। একটি বাড়তি উপদেশ, মিছিল করে সেদিন আইন সভা ঘেরাও করতে হবে, বাংলা ভাষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আইনসভার সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। আরও একটি খবর পাঠিয়েছেন যে, তিনি এবং মহিউদ্দিন সাহেব রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনশন করবেন। বেলতলায় দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল হবে।

এদিকে, অনশনের নোটিশ দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হলো ১৬ই ফেব্রুয়ারি। যাবার কালে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন শামসুদ্দোহাসহ আরো অনেকে। তাঁদের বঙ্গবন্ধু জানালেন তাঁর এবং মহিউদ্দিনের অনশনের কথা। অনুরোধ করে গেলেন যেন একুশে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল মিছিল শেষে আইনসভা ঘেরাও করে বাংলা ভাষার সমর্থনে সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবসহ সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সভা হলো। সেই সভায় জানানো হলো একুশের হরতালের প্রতি দৃঢ় সমর্থন।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে এ কথাই বলা চলে যে, তারা রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে শাসক মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছে। ছাত্রদের নেতৃত্বে ছিল বাম রাজনৈতিক ভাবধারায় প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এবং নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শেষোক্ত গ্রুপের অন্যতম ছাত্রনেতা। লক্ষ করার বিষয়, ভাষা ও লিপি বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বক্তব্যের বিশ্লেষণ করে মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত মাসিক নওবাহার-এ ১৩৫৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ওই সম্পাদকীয়তে বলা হয়–

...পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও লিপি সমস্যা আলোচনা করিলে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি অথবা পাকিস্তানে দেবনাগরী হরফ। (এখানে বাংলা বর্ণমালা সংরক্ষণের দাবি কি নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হয় না। ...তমদ্দুন মজলিস এবং রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের কর্মকর্তাগণ

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: পুরান ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে ইডেন কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

সকলেই চিন্তাশীল ও উচ্চশিক্ষিত; কেহই তাঁদের অবুঝ নন। রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা তাহারাও করেন। কেন তবে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অহেতুক আমাদের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হবে? আমরা এই ভাষা সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব জনাব অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের উপর ন্যস্ত করছি।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব কীভাবে দলবল নিয়ে আইন পরিষদ অভিমুখে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কেও প্রচলিত বই-পুস্তকে যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে সমালোচনার দিকটিই উঠে এসেছে, কিন্তু তার প্রভাব যে ছাত্র সমাজের উপর কতখানি ছিল তার ওপর জোর পড়েনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব জেলে ছিলেন। জেলে থাকলেও বাইরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বিশেষভাবে যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। ইউপিএল থেকে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলন শ্রেণিভিত্তিক ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কলকাতা থেকে আগত ছাত্ররা কোন কোন রাজনৈতিক দলে অবস্থান নিয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মুজিব সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা স্থির করলো এবং শামসুল হক এবং সে একই সাথে থাকলো' এটুকু উল্লেখ আছে।

একুশের রক্তাক্ত সংগ্রাম মুসলিম লীগ সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলে। সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্ত-বঙ্গবন্ধু তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুন্নত ও বিকশিত করার জন্য। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের নির্দেশ দিলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে জয়পুরহাটে আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী ও রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। তমুদ্দুন মজলিশ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তার ধারাকেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে দাঁড় করায়নি। এটি বাংলাভাষাকে সমর্থন করেছে, ভাষা আন্দোলনের উদ্যোগ পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমাদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা সম্পর্কে এ ধারণা দীর্ঘদিন কাজ করেছে। এই ধারণা যে সঠিক নয় তা আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক লিখিত ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য গ্রন্থে (৪৫-৪৯ পৃ.) আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, ভাষা আন্দোলনের ওপর বশীর আল হেলালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থ একটি মন্তব্য থেকেই তমদ্দুন মজলিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'– এই ধারণার সৃষ্টি হয়।

লক্ষ করার বিষয়, ছাত্রদের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের চুক্তির (৮ দফা) মধ্যে ৩নং ধারায় বলা হয়েছে ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার দিন যেদিন নির্ধারিত হয়েছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং তাকে পাকিস্তানের গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে'।

এই ৮ দফা চুক্তি মোতাবেক ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে এবং ভাষার দাবি আদায়ের সমর্থনে পরদিন ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মুজিব স্বয়ং এবং সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তিনি পরিষদ ভবনের দিকে গিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে রেসকোর্স এবং কার্জন হলে যখন উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন, তার প্রতিবাদ করার মতো সাহস ছাত্ররা পেয়েছিল ভাষার দাবিতে পূর্ববর্তী আন্দোলনের কারণেই।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ব্যতীত অনেকেই পরবর্তী সময়ে সৎ চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়ে এবং জরিমানা দিয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। অথচ এককথায় বলা চলে, আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও এর দেশব্যাপী সংগঠনের ফলেই ভাষা আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগের সংগঠন শক্তির কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আবেগহীনভাবেই বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

লেখক: সাংবাদিক, কবি, প্রাবন্ধিক ও মানবাধিকারকর্মী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গৌরবময় ইতিহাস। তাই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের পরিধিও ব্যাপক।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেও ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে যায়। একদিকে পাকিস্তান অপরদিকে ভারত। পাকিস্তান আবার দু'ভাগ হয়, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল বেশি এবং তাদের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম এবং তাদের ভাষা ছিল উর্দু। তা সত্ত্বেও সারা পাকিস্তানেই অফিস-আদালতে একমাত্র উর্দু ভাষাই ব্যবহৃত হতো।

কেন্দ্রে বাঙালিদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, অর্থনৈতিক বিষয়ে পশ্চাৎপদতার জন্য কেন্দ্রের উদাসীনতা এবং এ ধরনের আরও বিভিন্ন কারণে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাঙালিদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাতের দরুণ তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বাঙালিদের নিকট সব চাইতে দুঃখজনক একটি বিশেষ ঘটনা হলো, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের জনক নামে খ্যাত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার পূর্বে ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তার কথার উত্তরে ঘটনাস্থলেই দুজন ছাত্র বলেছিলেন, 'না, না, না'। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরপরই বাঙালিদের মনে পাকিস্তানি শাসকদের সম্পর্কে ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

তার এই কথার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণ রুখে দাঁড়ায়। তারা মাতৃভাষার স্বাধীনতা চায়। আর সে থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে দাঙ্গা শুরু হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের নানাভাবে ঠকাতো। পূর্ব পাকিস্তানে পাট জন্মাতো। অথচ সস্তায় এখান থেকে পাট কিনে নিয়ে তারা নিজ এলাকায় জুট মিল বানিয়ে সেখানে পাটের জিনিসপত্র তৈরি করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে চড়া দামে বিক্রি করত। এরূপ আরো উদাহরণ আছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মাতৃভাষার স্বাধীনতার জন্যই তাদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়ে।

১৯৫২ সালের কথা। পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এবং চরম আকার ধারণ করে। বাঙালিদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। এতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষেপে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মাতৃভাষার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের ডাক দেয়। পশ্চিমা সরকার পাকিস্তানি মিলিটারিদের বলে দেয়, রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি করতে। মিছিলের লোক দেখলেই যেন তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় মিছিল বের করে। তাদের সঙ্গে সাধারণ জনগণও যোগ দেয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এই মাতৃভাষা আন্দোলনের মিছিলে মিলিটারিরা গুলি ছুঁড়ে ছাত্রদের হত্যা করার জন্য। এতে মারা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রফিক, শফিউর, বরকত, সালাম ও জব্বারের মতো আরো অনেকে। এতে ধুমায়িত আক্রোশ আরও চাঙ্গা হতে থাকে। সেই শহিদদের স্মরণে তৈরি হয় প্রথম শহিদমিনার। ছাত্রছাত্রীরা শহিদমিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের বরণ করে। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এটা পছন্দ হলো না। পশ্চিম

১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মিত প্রথম শহিদমিনার

পাকিস্তানের সরকার সেই শহিদমিনারটি ভেঙে ফেলে। আবার ছাত্ররা রাস্তায় মিছিল বের করে শহিদমিনার নির্মাণের জন্য। মিলিটারিরা তাদের গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যায়।

এভাবে '৫৪, '৫৬, '৫৮, '৬০ সাল চলে যায়। এর মাঝে দফায় দফায় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের লড়াই চলে। যুক্তফ্রন্টের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে জয়লাভ করে। কিন্তু তবুও তাঁকে মন্ত্রীত্ব দেওয়া হলো না। কারণ তিনি বাংলা ভাষার দাবিদার ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তিনি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়।

অবশেষে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে বের হয়ে আসেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও বাঙালি বলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় বসতে পারেননি। অবশেষে তিনি আন্দোলনের ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দেন। তখন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীরা বুঝতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না। আর সেজন্যই ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে তারা হানা দেয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাসহ বড়ো বড়ো শহরগুলোতে। রক্তে রঞ্জিত করে ঢাকাসহ বড়ো বড়ো শহরগুলোর মাঠ-ঘাট-প্রান্তর।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

২৬শে মার্চ থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রুখে দাঁড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারিদের বিরুদ্ধে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু লোক পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ছিল। এরা মাতৃভাষা বাংলার বিপক্ষে ছিল। তারা পাকিস্তানি মিলিটারিদের সহায়তা করত। নিজ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিত পাকিস্তানি মিলিটারিদের হাতে। নিজ দেশের মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে এরা খেলা করত। পাকিস্তানি মিলিটারিদের হাতে নিজ দেশের মা-বোনদের তুলে দিত লজ্জা হননের জন্য। এরাই রাজাকার-আলবদর-আলশামস নামে পরিচিত হয়।

নয় মাস তুমুল লড়াইয়ের পর যুদ্ধ শেষ হয়। ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের মিলিটারিদের প্রধান সেনাপতি নিয়াজী যুদ্ধ বিরতির দলিলে সই করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীরা হার মানে বাঙালির কাছে। ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালিরা বিজয়ের মুখ দেখল। তারা পেল একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, যার নাম বাংলাদেশ এবং মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরও পাকিস্তানের কিছু দোসর রাজাকার-আলবদর এদেশে থেকে যায়। তারা বাংলা ভাষার বিরোধিতা করতে থাকে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর এই বিরোধিতা আরও বেশি কার্যকর হতে থাকে। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অফিস-আদালত-প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলায় রাখা হয়। যেমন– বাংলাদেশের রেডিও অফিসের মূল ভবনের নামকরণ করা হয়– বাংলাদেশ বেতার। কিন্তু ১৯৭৬ সালে নাম পালটে নামকরণ করা হয়– রেডিও বাংলাদেশ। এমন আরো কিছু সরকারি ভবনেরও নাম পরিবর্তন করা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তারা বাংলা ভাষার চেয়ে অন্য ভাষার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে। নিজ দেশের মাতৃভাষা রেখে তারা ইংরেজি ভাষার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়।

১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসেন। তিনি এসে নিজ দেশের মাতৃভাষাকে আবার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। তিনি অনেক ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেন যে, নিজ মাতৃভাষা হলো সবার ঊর্ধ্বে। অন্য দেশের ভাষা শিখতে চাইলেও নিজ দেশের মাতৃভাষাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তাঁর প্ররোচনায় অনেক ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আশার আলো পরিলক্ষিত হয়। তারা নিজ দেশের মাতৃভাষার মর্যাদা বুঝতে শিখে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো'র কাছে আবেদন জানায়, '২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস' কে আন্তর্জাতিকভাবে পালন করার জন্য। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য অনুমতি দান করে। কানাডাও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে। একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই থেকে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ অমর একুশের ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে।

বিশ্বের কোনো দেশে আমাদের মতো মাতৃভাষার জন্য এভাবে আন্দোলন হয়নি। সেদিক দিয়ে বাংলা ভাষার একটি বিশেষ গৌরবময় স্থান সারা বিশ্বে আছে যা সবার ঊর্ধ্বে। তাই আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব কমিয়ে সরকার ও সকল জনগণকে নিজ দেশের চ্যানেলগুলোর প্রতি সবাইকে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে হবে। বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে প্রচার করতে হবে। বাংলা ভাষায় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। বর্তমানের ডিজিটাল যুগে সব ধরনের ভাষাকেই শিখতে হয়। কিন্তু তাই বলে নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষাকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। মাতৃভাষার তাৎপর্য তথা অভিপ্রায়, উদ্দেশ ও মনোগত ভাবকে মনে-প্রাণে ধারণ করতে হবে। তাহলেই হয়ত একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা আমাদের জন্য সার্থক হবে এবং তাৎপর্যও উপলব্ধি করা যাবে।

লেখক: কলামিস্ট ও সাংবাদিক

হৃদয়জুড়ে মায়ের ভাষা

লিলি হক

মধুর আমার মায়ের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে বাংলা ভাষার আন্দোলন ছিল মূলত ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় অবিস্মরণীয়ভাবে ঘটে যাওয়া ঐশ্বর্যমণ্ডিত আবেগে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ যোগ্যতায় একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ আন্দোলনের বীজ বপন হয়েছিল সুদীর্ঘকাল আগে। ফলাফল সুদূরপ্রসারী জেনেই মহান ভাষা আন্দোলনের রূপকাররা ছিলেন পরিকল্পিত বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একথা শুনে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আন্দোলন দানা বেধে জনসমুদ্রের উত্তাল মিছিলে পর্যবসিত হয়। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে আন্দোলন দমনে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল কিছু রাজনৈতিক কর্মী মিলে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক, সালাম, এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বরকত ও আব্দুল জব্বারসহ আরো অনেকে। এছাড়া ১৭ জন ছাত্র-যুবক আহত হয়। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রা সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক, রিকশাচালক আউয়াল এবং এক কিশোর। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। এ নির্লজ্জ, পাশবিক, পুলিশি হামলার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে সেদিনই পদত্যাগ করেন। ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহিদমিনার, যা ২৪শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদমিনারের উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু এদেশের অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করার চিন্তা-ভাবনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যেদিন ক্ষমতা পাবেন সেদিন থেকেই তিনি দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করবেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের রাষ্ট্রীয় সকল কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশ এক ভাষাভিত্তিক দেশ। তাই এদেশে বাংলা ভাষার একক আধিপত্য প্রবলভাবে হৃদয়ে ধারণ করি। প্রয়োজনের পরিধিতেই বাংলা ভাষার সম্ভাবনা ও উন্নতি দৃশ্যমান। বর্তমানে ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি, বেতার, টিভি, বিজ্ঞাপন, পত্রপত্রিকা তথা গণমাধ্যমগুলোতে বাংলাভাষার ব্যবহার সময়ের প্রয়োজনে বিস্তৃত পরিসরে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রজন্মের হাতেই পূর্ণাঙ্গ অর্জন হবে– এ প্রত্যাশা আমাদের।

প্রাণের আকুতি নিয়ে মা'কে মা বলে সম্বোধনে অভ্যস্ত বাঙালি জাতি মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে বুকের তাজা রক্তে ভিজিয়েছিল এ দেশের মাটি। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জীবন দিয়েছে অসংখ্য তরুণ, কিশোর ও সাধারণ মানুষ। একুশ এলেই বাঙালির কান্না গান হয়ে আলোড়ন তোলে মানুষের অন্তরে। ধর্মীয়ভিত্তিতে ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ, ১৯৪৮-এর জিন্নাহর ভাষণ থেকে বাঙালির হৃদয়ে প্রোথিত হয় ভাষার জন্য ভালোবাসার শেকড়। তারই ধারাবাহিকতায় সকল ভাষাপ্রেমী মানুষেরা ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম মাটি ও মানুষের অধিকার আদায়ে রক্তঝরা আন্দোলনের নাম। প্রিয়জন হারানোর ব্যথায় শোকাহত মহান একুশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রক্তাক্ত বর্ণমালার কথা, স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৫২-এর রাজপথে তরুণ প্রাণের আত্মদানের কথা। আমরা এখন স্বাধীন। মুক্ত আমার প্রাণের ভাষা। কণ্ঠে আমার মধুর বর্ণমালা। অপরাজেয় বাংলার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সন্তানেরা পাঠ করে অ আ ক খ।

রক্তরাঙা একুশ কড়া নাড়ে বাঙালির তালাবদ্ধ দরজায়। উৎসবে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার, বাংলা একাডেমি আর বটমূলে কথা কয় বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার-এর রক্তকণা বাঙালির চেতনায়। প্রিয় বর্ণমালা রোপণ করি সবাই মিলে মেধা ও মননে হৃদয়ের মৃত্তিকায়। মাতৃভাষার অক্ষরগুলো সাজাই অকৃত্রিম ভালোবাসায়। তুমি এসেছ আবার ফিরে আমাদের দুঃখের আগুন জ্বলা প্রজ্বলিত ঘরে ঘরে, যে গোলাপ ফুটেছিল লাল রং নিয়ে, বেদনায় সেই একুশের তপ্ত দুপুরে, সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার-এর মতো আরও নাম না-জানা বীরের তাজা রক্তে সবুজ ঘাসের পরে। শাসকের গুলি ছিনিয়ে নিল আমার ভাইয়ের সজীব প্রাণ। আজও সুবাসিত হয়ে ফুটে আছে রক্তগোলাপ। বুক ভরে নিই সেই অমর গোলাপের ঘ্রাণ, ভুলি নাই তোমাদের অবদান। তোমরা যে বাংলার মাটিতে রবে চির অম্লান। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। বাঙালির হৃদয়ে তুমি হয়ে আছ মহীয়ান। হৃদমাঝারে লালন করা আবেগের স্ফূরণে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়ে স্মরণ করি হে বীর শহিদান, নিজের প্রাণের বিনিময়ে রেখেছ বাংলা ভাষার সম্মান।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আমার প্রিয় মাতৃভাষা অধিকার রক্ষার দিবস বিশ্বের দরবারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে– আসুন এ আনন্দে সবাই দেশ, জাতি, পতাকাকে ভালোবাসি। সুখী-সমৃদ্ধশালী, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। তাহলেই বীর শহিদদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে ভালোবেসে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক 'চয়ন' ও জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

পাশা মোস্তফা কামাল

মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অন্যতম মাইলফলক। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতার পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর প্রভুত্ব শুরু করে। তারা প্রথমেই আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্টা করল যাতে বাঙালি জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু বাঙালি জাতি সেটা মেনে নেবে কেন?

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ

পাকিস্তানি শাসকরা উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে বাঙালিরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯৪৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার বৈঠকে রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিম লীগ সদস্যের সেই মত। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা বাংলা। তাই বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিক দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তিনি তখন সবেমাত্র কলকাতা থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। কলকাতায় থাকতেই তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহধন্য ছিলেন। সেখানে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল। ছাত্রসমাজে তাঁর এতই গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলকাতা ইসলামীয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সারা দেশে প্রতিবাদ সভা করা শুরু করলেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যৌথভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করল। সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হলো। সংগ্রাম পরিষদ জেলায় জেলায় কাজ শুরু করল। বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ১১ই মার্চের তিনদিন আগে ঢাকা ফিরে আসেন। দৌলতপুরে মুসলিম লীগ সমর্থক ছাত্ররা বঙ্গবন্ধুর সভায় আক্রমণ করে সভা ভেঙে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি ওই সভায় বক্তৃতা করে ফিরে এসেছিলেন।

১১ই মার্চের আগের রাতে ঠিক করা হলো কে কোথায় পিকেটিং করবে। সমস্ত ঢাকা শহর পোস্টারে পোস্টারে ভরিয়ে দেওয়া হলো। সকালে শত শত ছাত্র ইডেন বিল্ডিং, জিপিও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। মুসলিম লীগ ছাত্রদের ওপর ভাড়াটিয়া গুন্ডা লেলিয়ে দিল। সকাল আটটায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের ওপর ভীষণ লাঠিচার্জ হলো। অনেক ছাত্র জখম হয়েছে। অনেককে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছে তারা।

এ সময় বঙ্গবন্ধু ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে পিকেটিং করছিলেন। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গের কর্মীবাহিনীকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধু সেখানে বসে পড়েন। তাঁকে সেখান থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ১১ তারিখ জেলে নেওয়ার পর তাঁকে ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় মুক্তি দেওয়া হয়।

১৫ই মার্চ সকালে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলা) মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বার্তা নিয়ে ছাত্রনেতা কমরুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী কর্মপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত আছে এবং তাদের দাবি-দাওয়া মানতে রাজি আছেন। এরই ভিত্তিতে কর্মপরিষদের জরুরি বৈঠক ডাকা হয় সকাল আটটায় ফজলুল হক হলে। সিদ্ধান্ত নিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক হয় সকাল এগারোটায়। বৈঠকে আট দফা চুক্তি হয়। খুব সংক্ষেপে শর্তগুলো ছিল এরকম–

১. ভাষার প্রশ্নে যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে।

২. প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পুলিশের নির্যাতনের তদন্ত করে বিবৃতি প্রদান করবেন।

৩. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাকিস্তান গণপরিষদে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

৪. প্রদেশের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা।

৫. আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৬. সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৭. সব এলাকার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে।

৮. প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত হয়েছেন যে, আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।

বঙ্গবন্ধু কারামুক্ত হয়ে এসে এ চুক্তিকে আপোশের দলিল বলে ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রস্তাবে ১৬ই মার্চ সকালবেলা ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জরুরি বৈঠক বসে। বৈঠকে আট দফা চুক্তিনামার ৩টি সংশোধনী এনে ওই দিনের ছাত্রসভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংশোধনী তিনটি ছিল এরকম–

১. সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় পুলিশি নির্যাতনের তদন্ত করতে হবে।

২. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পূর্ব বাংলা পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বিশেষ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

৩. উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করাতে না পারলে পূর্ব বাংলা মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ করতে হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রভাতফেরি

১৬ই মার্চ বেলা দেড়টায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা ডাকা হয়েছে। ছাত্রসভা শুরু হওয়ার পর ছাত্রলীগ নেতা নঈমুদ্দীন সদ্য কারামুক্ত বঙ্গবন্ধুকে সভায় সভাপতিত্ব করার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ওই সভায় একমাত্র বক্তা। ছাত্ররা দাবি করল আইন পরিষদের কাছে গিয়ে খাজা সাহেবের কাছে এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলো পেশ করবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বললেন, খাজা সাহেবের কাছে কাগজটা পৌঁছে দিয়েই সবাই আইনসভার এলাকা ছেড়ে যেন চলে আসে। কেউ সেখানে থাকতে পারবে না। সভা শেষে শোভাযাত্রা করে সবাই সেখানে গেলেন। কাগজটা খাজা সাহেবের কাছে পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধু আবার সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে সবাইকে চলে যেতে বললেন। তিনিও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে যাবার জন্য রওয়ানা দিলেন। কিছু দূর এসে দেখলেন কিছু ছাত্র ও জনসাধারণ একত্রিত হয়ে সেখানে স্লোগান দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেখানে গিয়ে আবার বক্তৃতা করে তারপর হলে ফিরলেন। সেদিন বিকেল বেলাও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে জনগণ ও ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল হয়েছে। নেতারা আন্দোলন কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও জনগণ সেটা মানছিল না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত ছিল। বিকেল চারটায় অনেক লোকের জমায়েত হলো আইনসভার কাছাকাছি এলাকায়। বঙ্গবন্ধু সেদিকে ছুটলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখেন ওই এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তিনিও আক্রান্ত হলেন। কয়েকজন কর্মী তাঁকে পলাশী ব্যারাকের পুকুরে নিয়ে তাঁর চোখে পানি দিলেন। একটু সুস্থ বোধ করে আবার ছুটলেন ফজলুল হক মুসলিম হলের দিকে। কারণ ওখানে তখন ছাত্ররা একজন এমএলএকে ধরে এনেছে। তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে চাচ্ছে যে, তিনি পদত্যাগ করবেন। ওই এমএলএর নাম ছিল ডা. মোজাম্মেল। তিনি বাগেরহাট থেকে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে চিনতেন, তিনিও বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু এসে তাঁর যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করলেন।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাগুলো বঙ্গবন্ধু লিখেছেন তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে*। তিনি লিখেছেন–

> রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুধু ঢাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না। ফরিদপুর ও যশোরে কয়েক শত ছাত্র গ্রেফতার হয়েছিল। রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুর ও আরও অনেক জেলায় আন্দোলন হয়েছিল। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (মুসলিম লীগ সমর্থিত-লেখক) চেষ্টা করেছিল এই আন্দোলনকে বানচাল করতে, কিন্তু পারে নাই। এই আন্দোলন ছাত্ররাই শুরু করেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের পরে দেখা গেল জনসাধারণও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীরাও একে সমর্থন দিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একদল গুন্ডা আক্রমণ করলে পলাশী ব্যারাক থেকে সরকারি কর্মচারীরা এসে তাদের বাধা দিয়েছিল। যার ফলে গুন্ডারা মার খেয়ে ভাগতে বাধ্য হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ঢাকা শহরের জনসাধারণের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সরকার থেকে প্রপাগান্ডা করা হয়েছিল যে, কলকাতা থেকে হিন্দু ছাত্ররা পায়জামা পরে এসে এই আন্দোলন করছে। যে সত্তর পঁচাত্তরজন ছাত্র বন্দি হয়েছিল তার মধ্যে একজনও হিন্দু ছাত্র ছিল না। এমনকি যারা আহত হয়েছিল তার মধ্যে একজনও হিন্দু ছিল না। তবু তখন থেকেই 'যুক্ত বাংলা ও ভারতবর্ষের দালাল, কমিউনিস্ট ও রাষ্ট্রদ্রোহী'-এই কথাগুলি বলা শুরু হয়, আমাদের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে। এমনকি সরাকরি প্রেস নোটেও আমাদের এইভাবে দোষারোপ করা হত।
>
> বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। পাঞ্জবের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষা বলে, সিন্ধুর লোকেরা সিন্ধি ভাষায় কথা বলে, সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি ভাষায় কথা বলে। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তবুও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ভায়েরা উর্দু ভাষার জন্য দাবি করে, আমরা আপত্তি করবে কেন? যারা উর্দু ভাষা সমর্থন করে তাদের একমাত্র যুক্তি হল উর্দু 'ইসলামিক ভাষা'। উর্দু কী করে ইসলামিক ভাষা হল আমরা বুঝতে পারলাম না।
>
> [*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*- শেখ মুজিবুর রহমান-পৃ. ৯৮]

১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হলো। কারণ পাকিস্তান হওয়ার পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম ঢাকায় আসবেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাব এবং এ সম্পর্কিত আলোচনা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্ব বাংলার (কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত) কংগ্রেস দলীয় গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই অধিবেশনেই সর্বপ্রথম উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন।

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি: ঢাকা হলের পিছনে নির্মিত শহিদমিনার

১৯শে মার্চ জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় এলেন। গভর্নর জেনারেল হিসেবে ঢাকায় তাঁর এই সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গভর্নর জেনারেল নয় পাকিস্তানের জাতির জনক হিসেবেও তাঁর এই সফর নিয়ে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। ২১শে মার্চ তিনি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ভাষণ দেন। সেদিন বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে বহু লোক গিয়েছিল রেসকোর্সে তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেদিন চার-পাঁচ শত ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। তাঁরা সবাই এক জয়গায় একসাথে ছিল বক্তৃতা শোনার জন্য। সবাই ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক। সভায় জিন্নাহ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'। সাথে সাথে একযোগে সবাই হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল 'মানি না'। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে জিন্নাহ পুনরায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বললে ছাত্ররা আবারও তাঁর সামনেই 'না না না' বলে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহ সাহেব প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন। জিন্নাহ সাহেব হয়ত ভাবতেও পারেননি তাঁর মুখের সামনে এমন প্রতিবাদ হবে।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৪৮ সালে এই আন্দোলনের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর ছিল অসাধারণ ভূমিকা। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং মাঠে থেকে নেতৃত্বদানের গুণাবলি এই আন্দোলনকে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছিল। পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তাকে তোয়াক্কা করেননি তিনি। বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষা বাংলাকে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলনের সূচনা করেছেন, গ্রেফতার বরণ করেছেন। জিন্নাহ সাহেব চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর ফজলুল হক হলের সামনে এক ছাত্রসভা হয়। সেই সভায় কেউ একজন বক্তৃতা করে বলেছিল, 'জিন্নাহ যা বলবেন, তাই আমাদের মানতে হবে। তিনি যখন উর্দুই রাষ্ট্রভাষা বলেছেন তখন উর্দুই হবে'। বঙ্গবন্ধু তার প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।'

একদিকে ভাষার দাবিতে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ যখন আন্দোলনে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছিল তখনই পাকিস্তানি শাসকচক্র তাদের হিংস্র থাবা দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করে দিচ্ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের কিছু ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট আহ্বান করলে বঙ্গবন্ধু এতে তাঁর সমর্থন দেন। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ২৯শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে তাঁকে আর্থিক জরিমানা করে। শুধু তা-ই নয়, বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যতে কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে না– এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে বলে। বঙ্গবন্ধু আর্থিক জরিমানা কিংবা লিখিত অঙ্গীকার কোনোটাই দিতে অস্বীকার করেন। বঙ্গবন্ধু এই অন্যায় আদেশ মেনে না নেওয়ায় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯শে এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনের কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসে তাঁকে মুক্তি দিলেও ১৪ই অক্টোবর তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ওই দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা আগমন উপলক্ষে তিনি ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবার তাঁকে দুই বছর পাঁচ মাস জেলে আটকে রাখা হয়।

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আবার সেই একই ঘোষণা দেন। সারা পূর্ব বাংলায় এর প্রতিবাদ ওঠে। বঙ্গবন্ধু তখনো কারাগারে। তিনি কারাগার থেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস পালনের আহ্বান জানান। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ বাংলা মায়ের অনেক সন্তান শহিদ হন। ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান সরকার। জেল থেকে বের হয়ে বঙ্গবন্ধু আবার শুরু করেন বাঙালির মুক্তির আন্দোলন। যে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রূপ নেয়। আমরা অর্জন করি আমাদের মহান স্বাধীনতা।

লেখক: ছড়াকার, প্রাবন্ধিক ও প্রধান সম্পাদক, ঝুমঝুমি

বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধার সুকর্ণ

বিনয় দত্ত

১৯৭২ সালে ডেভিড ফ্রস্ট শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেন, 'ডেভিড ফ্রস্ট: মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

শেখ মুজিব: মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, কামাল আতাতুর্ক– এদের জন্য আমার মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। এই সকল নেতাই তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা হয়েছিলেন।' [পৃ. ৬০]

এই সাক্ষাৎকারটি ১৯৯৭ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর থেকে প্রকাশিত শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ সম্পাদিত 'আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম' বইয়ে 'আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম' শিরোনামের লেখায় 'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকার'টি প্রকাশিত হয়।

সাক্ষাৎকারে একটি বিষয় লক্ষণীয়। শেখ মুজিব বলছেন, 'আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম।'

এই লাইনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিব সহজভাবে বলতে পারতেন, যে তিনি ড. সুকর্ণকে পছন্দ করতেন বা শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তা বলেননি। তিনি বলেছেন, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। এইখানেই মূল তত্ত্বকথাটি লুকিয়ে আছে। আমরা সেই তত্ত্বকথাটি জানতে চাই।

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতকে শাসন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি তাদের আগমন ঘটলেও আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে কোম্পানি বঙ্গের সর্বময় কর্তায় পরিণত হয়। ইউরোপীয়রা সাগরের ওপাড়ে গিয়ে জনমানবশূন্য বা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা দখল করে স্ব স্ব জাতির পক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করলেও বঙ্গদেশই প্রথম সভ্য দেশ, যেখানে একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

ব্রিটিশদের শাসনামল সম্পর্কে শেখ মুজিব অনেক বেশিমাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি সারাজীবন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন। যে মানুষ গণতন্ত্রের জন্য লড়ে গেছেন তিনি কি ঔপনিবেশিকতা বা উপনিবেশবাদ পছন্দ করবেন? কখনোই না। কেন তিনি পছন্দ করবেন না। নিশ্চয় তার কারণ আছে। সেই কারণটা আসলে কি?

উপনিবেশবাদ হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা এক অঞ্চল থেকে আরেকটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং শোষণ। উপনিবেশ শব্দটি এমন একটি সেট যা ঔপনিবেশিক শক্তি এবং উপনিবেশের মধ্যে অসম সম্পর্ক এবং প্রায়ই ঔপনিবেশিকদের এবং আদিবাসীর মধ্যে অসম সম্পর্ক বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হয়।

উপনিবেশবাদের সংজ্ঞায় অসম সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে আর গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে, প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকারের কথা। এইখানেই মূল দ্বন্দ্ব।

দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়। এই বিপরীতধর্মীতা শেখ মুজিব জানতেন এবং বুঝতেন। তিনি ঔপনিবেশিকতা পছন্দ করতেন না কারণ তাতে জনগণের কল্যাণ বলে কিছু থাকে না, সবকিছুই হয়ে যায় রাষ্ট্রের। জনগণ খেতে পারল, নাকি অশান্তিতে থাকলো তা রাষ্ট্র কখনো দেখবে না, রাষ্ট্র দেখবে শুধু রাষ্ট্রের ভালোমন্দ। এই কারণেই তিনি সাংবাদিক ও টেলিভিশন উপস্থাপক ডেভিড ফ্রস্টকে বলেছেন, 'আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম।'

যে সুকর্ণকে শেখ মুজিব বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন সেই সুকর্ণ আসলে কে? ড. সুকর্ণ হলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগঠিত সফল

মুজিববর্ষ থেকে টাকা পাবে শিক্ষার্থীরা

মুজিববর্ষ থেকে এক কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকার পাশাপাশি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ কেনার জন্য টাকা দিবে সরকার।

১৩ই জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যদিবসের টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রদান ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রেখেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার আনন্দকে আরো জোরালোকরণের জন্য প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে বছরের শুরুতে শিক্ষা উপকরণ (ড্রেস, জুতা, ব্যাগ) কেনার জন্য প্রাথমিকভাবে ৫০০ টাকা করে প্রদানের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরো বলেন, স্কুলের সার্বিক পরিবেশ ও ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অবস্থা অধিকতর প্রফুল্লকরণের জন্য উপবৃত্তির পাশাপাশি এক কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে বছরের শুরুতে এককালীন ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো– দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা, যেন তারা সন্তুষ্টি এবং আনন্দের সঙ্গে স্কুলে যেতে পারে।

প্রতিবেদন: আনোয়ার চৌধুরী

ড. সুকর্ণ

সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী। সুকর্ণের সঙ্গে শেখ মুজিবের জীবনের অনেককিছুই মিল আছে।

সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃত। শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির জনক। সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ছিলেন আর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

সুকর্ণের জীবনটা বেশ সংগ্রামের। বঙ্গবন্ধুর জীবনও বেশ সংগ্রামের। একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিতে গিতে তাঁকে কি না সহ্য করতে হয়েছে। পদে পদে রাজনৈতিক কারণে কারাগার বরণ থেকে শুরু করে সকল কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্য সুকর্ণকেও কারগারে থাকতে হয়।

সুকর্ণ ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। সুকর্ণ ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা এবং এক দশকেরও বেশি সময় রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে ওলন্দাজ কারাগারে আটক ছিলেন। পরবর্তীতে জাপানি বাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় অভিযান পরিচালনা করলে তিনি ও তার সঙ্গীরা কারাগার থেকে মুক্তি পান। তিনি ও তাঁর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীরা জাপানিদের যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য এক চুক্তিতে আসেন এবং বিনিময়ে জাপানি বাহিনী তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের সুযোগ দেয়। জাপানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর সুকর্ণ ও মোহাম্মদ হাতা ১৭ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা করেন, যেখানে সুকর্ণ প্রথম রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। ১৯৪৯ সালে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত সুকর্ণ জনগণকে একত্রিত করে কূটনৈতিক ও সামরিক পন্থায় পুনরায় ওলন্দাজ উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করেন।

সুর্কণের রাজনৈতিক দর্শন মূলত মার্কসবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের সংমিশ্রণ ছিল। তিনি সবসময় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। একই বিষয় বঙ্গবন্ধুও চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই কারণে এই চারটি স্তম্ভকে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি করা হয়।

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সুকর্ণ দেশের ব্যবস্থাপনাকে নতুন একটি দিগন্তে নিয়ে যান। তিনি যেমন একদিকে ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট দলকে নিরাপত্তা দিতেন তেমনি ইসলামপন্থি ও সামরিক উপস্থিতিও মেনে নিয়েছিলেন। সুকর্ণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কিছু উগ্রপন্থি বৈদেশিক নীতি চালু করেছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর একটি আন্দোলনে ইন্দোনেশিয়ার বামপন্থি দল ভেঙে গিয়েছিল এবং সুহার্ত নামে তাঁর এক জেনারেল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ২১শে জুন ১৯৭০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তাহলো সুকর্ণ এবং বঙ্গবন্ধু দুজনই সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ ছিলেন। তাঁরা দুজনই বই লিখেছেন এবং তারা দুজনই গান পছন্দ করতেন। সুকর্ণ যেমন তার আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধুও তেমনি তাঁর আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন।

ড. সুকর্ণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুজন দু জায়গা, দুই দেশের মানুষ। তাদের সাথে কারো কখনো দেখা হয়নি। দেখা না হলেও তাদের কাজে ছিল অদ্ভুত মিল। দুজনেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গিয়েছেন।

কাকতালীয়ভাবে দুজন মহান নেতার আদর্শিক জায়গা একসাথে মিলে গিয়েছে। মজার বিষয় হলো, সুকর্ণর পতন সম্পর্কিত বই বঙ্গবন্ধু কারাগারে বসেই পড়েছিলেন, যার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর ‘কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)’ বইয়ে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ‘আলো জ্বালানই ছিল। সুর্কণর পতন সম্বন্ধে বই দুটি পড়তে লাগলাম। কিন্তু মন বসছে না, নানা চিন্তা ঘিরে রাখছে। কি করব বসে বসে শুধু পাইপ খেতে লাগলাম।’ [পৃ. ২৫৮]

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

বিশ্ববীরের শততম জন্মদিনে

শাফিকুর রাহী

তোমার সৌধ প্রাচীর ঘিরে আবেগেরই শ্রাবণধারা,
লক্ষকোটি মানুষ জানে তুমিই হলে ধ্রুবতারা।
জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে সারা বিশ্ববাসী
খুশির বানে আত্মহারা বাজে সুখের মোহন বাঁশি।
হাটে-মাঠে নদীর ঘাটে জাগলো যে সুর সবার প্রাণে,
তারার মেলায় নৃত্য করে পিক-পাপিয়া নীল আসমানে।
মানবতার পরম বন্ধু বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে
সকল মানুষ জানায় সালাম জাতির পিতার রক্তঋণে।
বিশ্ববিবেক শ্রদ্ধা জানায় আনন্দ উৎফুল্ল মনে,
মহান বন্ধুর উদ্ভাসিত-স্বদেশবাসীর আয়োজনে।
কাল-মহাকাল সাক্ষী দেবে ত্যাগের বিরল ইতিহাসে,
বিশ্ববীরের জন্মদিনে হাসিখুশি জয়োল্লাসে।
মাটি মানুষ ভালোবেসে জগজ্জয়ী হলেন পিতা,
বঙ্গমায়ের গর্বগাথা মানবতার মহান মিতা।
যে মহাবীর দুঃশাসনের ভাঙলো আঁধার জয় গৌরবে
দশদিগন্ত উঠল মেতে আলোকিত সুখ-সৌরভে।
অন্ধকারের বন্ধ ঘরে জ্বালবে আলো শপথ নিলেন,
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার জাতির পিতা আদেশ দিলেন।
সতেরো মার্চ টুঙ্গিপাড়ার রক্তপলাশ, সবুজ ঘাসে,
কৃষক-শ্রমিক মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনার মনাকাশে
শিল্পী কবি'র সৃজনধারায় ধ্যানী-জ্ঞানীর মনের মাঝে
সুখ-আনন্দের জোয়ার ভাটায় এ কোন শোকের সুর যে বাজে!
অধীনতার ভাঙতে শিকল যে মহাবীর আঁধার রাতে
টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নিয়ে শপথ নিলেন সুপ্রভাতে।
বিশ্বজুড়ে বঙ্গপিতার ত্যাগের অমর গর্বগাথায়
সকাল-সন্ধ্যা পাখির গানে রহিম মাঝি পাল যে খাটায়।

মুজিবের বাংলা

সুজন হাজারী

বাবার মোটা ফ্রেমের পুরানো কালো চশমা
ঘষাঘষি হিজিবিজি দাগগুলো মিথ পুরু লেন্স
শৈশবের কতুহলে এটেছি চোখে
বালক বয়সে পাকামো হয়ে গেছি বাবা
পাকা চুলে বিলি কেটে বেছে দেয়
বধূ বেশে পাড়ার হালিমা খাতুন
বৃন্দাবনের রাজপুত্র রাখাল গোপাল
গোমাতা ভালোবাসে ধবলী নামের গাভী
গোচরে ঘাস খায়
মাঠ ভরা পাকা ধান ক্ষেত
অঘ্রাণে নবান্ন উৎসবে টইটুম্বুর ধুম পাড়া গাঁয়ে
রোদ মাথায় আর এফ এল এর ছাতা মেলে
আলপথে হেঁটে বট ছায়ায় পথিক জিরায়
গাছপাতার আড়ালে লাল ঠোঁট সবুজ টিয়া পাখি
শূন্যাকাশে দুঙের জাতীয় পতাকা ওড়ে
নদী মাতৃকার রাখি বন্ধনে
গেরিলারা শিলিগুড়ি ক্যাম্পের ট্রেনিং শেষে
বিজয়ের হাসি মুখে ফিরেছে মুজিবের বাংলায়।

কবিতায় গল্পে মুজিব

খান চমন-ই-এলাহি

নক্ষত্র ভরা রাত কিংবা নিমগ্ন জোছনায়
একা, একটি শব্দহীন দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষের শাখে
একটি পাখি স্তন্যপায়ী প্রাণী উড়ে এসে বসে
জীবনের গল্প খোঁজে
স্মৃতি হাতড়িয়ে সে ফিরে পায় বাংলাদেশ
পতাকা সম মর্যাদায় শেখ মুজিবুর রহমান।
নস্টালজিয়া ভর করে
স্বামী-সন্তান-সংসারি আয়নায় দেখে
কলকাতা, নোয়াখালী, পাঞ্জাবে গোষ্ঠীগত রায়ট-দাঙ্গা
মানুষ মানুষের রক্ত চুষে নেওয়ার বর্বরতা
নারীর সম্ভ্রমহানি, বিভৎসতা
সম্পদ লুটের বৈশাখি তাণ্ডব
করাচি-লাহোর পতাকা ওড়ে সোহরাওয়ার্দী নেই
দিল্লিতে পতাকা ওড়ে-মহাত্মা গান্ধী নেই
অথচ দেশভাগ দ্বিজাতিতত্ত্ব দুটি দেশ
এবং মধ্য আগস্ট উনিশশ সাতচল্লিশ
ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ-স্বাধীনতা শুরু
অমরত্বের ইতিহাস শুরু-ভারত ও পাকিস্তানের।

মুজিব তুমি আঁধারে আলোর দূত

দেলওয়ার বিন রশিদ

তুমিতো অনন্য কীর্তিমান, পুঞ্জিভূত আঁধারে
তুমি আলোর দূত
তুমি বাংলার সূর্য নায়ক, আশা স্বপ্নের উৎসমূল
অসহায় দুঃখী মানুষের তুমি সান্ত্বনা
তুমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাঙালি হৃদয় চিরভাস্বর
চির অমর তোমার নাম,
এই বাংলা তোমার সুখ স্পর্শে ধন্য
তোমার জন্যে চির গর্বিত।
তুমি মহৎ উদার, তুমিতো মানবতার প্রতীক
তুমি বাঙালির শৌর্য-বীর্যের নায়ক
তুমি মেহনতি মানুষের কর্মপ্রেরণা, উদ্যম
তুমিই বিজয় সংগীত,
বাঙালির হৃদয়ে তোমার অধিষ্ঠান
তুমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি বাঙালি জাতির চিরদিনের শক্তি সাহস প্রত্যয়
শৃঙ্খলমুক্ত নতুন জীবন
আলোর উৎস ধারা।

বঙ্গবন্ধু তোমার জন্ম শতবর্ষে

আবুল হোসেন আজাদ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থপতি জাতির পিতা
কালজয়ী ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু
তোমার সাতই মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণের অনুরণনে
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম
প্রতিরোধ থেকে মুক্তিযুদ্ধে
পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একাত্তরে।
তোমার জন্ম শতবর্ষে হাজার সালাম
হৃদয়ের অতলান্তে উৎসারিত গভীর শ্রদ্ধায়
ভালোবাসায় কৃতজ্ঞতায়।
তোমার বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে
বাঙালি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তুমি আলোক স্তম্ভ
আঁধার রাতের ধ্রুবতারা।
হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
শুধু তোমার জন্যে পেয়েছি একটি লাল-সবুজের পতাকা
একটি স্বাধীন মানচিত্র বাংলাদেশ।
তোমার স্বপ্নময় চিন্তাধারা বাংলার বুকের
নিরন্ন অসহায় মানুষের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত
আজ স্বপ্ন নয়, বাস্তব শুধু তোমার জন্য
তোমার জন্ম শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তোমাকে বরি স্মরণে শ্রদ্ধায়
ফুলেল শুভেচ্ছায় চিরন্তনে।

মুজিববর্ষ ২০২০

রুস্তম আলী

ঝরনার কল কলতানে
পাখির কিচিরমিচির ডাকে
সমুদ্রের ঢেউয়ে
আকাশে-বাতাসে শুনি
মুজিববর্ষ-মুজিববর্ষ প্রতিধ্বনি।
বাংলার বর্ণমালায়
সারে.....গা.....মা
পা.....ধা....নিসায়
বাউলের একতারা সুরে শুনি
মুজিববর্ষ-মুজিববর্ষ প্রতিধ্বনি।
সিন্ধু থেকে শিশির বিন্দু
আকাশ থেকে সবুজ ঘাসে
বায়ু থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসে শুনি
মুজিববর্ষ-মুজিববর্ষ প্রতিধ্বনি।
সূর্যরশ্মি, চাঁদ, তারার, আলোয়ে
পাখির পালকে–
'মুজিব' নামটি লেখা হবে
'গিনিস বুকে' মুজিববর্ষে।
মুজিব আছে মুজিব থাকবে
হাজার বছর পরে–
অন্তকাল ধরে।

মুজিব মরে নাই

নজমুল হেলাল

যে জাগায় সে ঘুমায় না
যে প্রেরণা, যে শক্তি সাহস আলোকবর্তিকা
তাঁকে মৃত বলতে নেই!
যদি মৃত ভেবে অযৌক্তিক তৃপ্তি খোঁজ
অন্যায় হবে–
বীজমন্ত্র মরে গেলে মানুষের কী থাকে আর?
মুজিব মরে নাই! মৃত বলো না তাঁকে!
অধর্ম নাশক শোষকের কাছে ত্রাস
বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে ভেঙে
উন্মুক্ত আকাশ যে দেয় রঙিন করে আজও
স্বপ্নভরা হৃদয়ের সৃষ্টিশীল চঞ্চল আকাশ–
তাঁকে যারা মৃত বলতে চায়
তারা বোধ হয় ইতিহাস পড়েনি মানুষের–
দাবানল থেমে গেলে
অরণ্যের জেগে ওঠা চির সবুজ দেখেনি আজও
ধ্বংস স্তূপের ভেতরে লুকিয়ে থাকা তারুণ্য
দেখা হলো না তাদের।
অবহেলা অমর্যাদা অনাদর যাঁকে দুর্বল করে না
জাতি আর জাতির কণ্ঠস্বর, অভিন্ন নক্ষত্র হয়ে ওঠে
দেশ দশ আর পতাকার বিকল্প যিনি
তাঁকে কেন মৃত বলার দুঃসাহস দেখাও?
এখনো যে মুজিব বেঁচে আছে অন্তরে অম্লান
সে মুজিব মরে নাই মৃত বলো না তাঁকে!
বঙ্গ ছাড়িয়ে মানববন্ধু প্রেরণা বিশ্বময়
দুর্নীতিবাজদের চোখে জীবন্ত আতঙ্ক আজও
ধর্ষক লুটেরাও জানে বিজয় মানে মুজিব
মুক্তিযোদ্ধারা এক একটি লাল গোলাপ
প্রতিবাদের মশাল যেন মুজিব ছাড়া আর কিছু নয়
আজও অহংকার আমাদের কোটি কোটি জনতার!
মুজিব রাঙা ফুল সুবাসিত, মুজিব মর্ম মূল চেতনার
ভাষা আশাতে দেশপ্রেম মানুষে মানুষে ভালোবাসাতে
বাতিঘর জাতিস্বর মুজিব, এখনো স্বপ্ন দেখায়
অমর কবিতা লেখায় মুজিব আমাদের
মৃত বলো না তাঁকে মুজিব মরে নাই
মুজিব চেতনায়!

খোকন সোনা

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

খোকন সোনা শেখ মুজিবুর
জন্ম টুঙ্গিপাড়ায়
বঙ্গ জাতির মুক্তি দানে
দীপ্ত কণ্ঠে দাঁড়ায়।
অগ্নিঝরা একাত্তরে
তাঁরই বজ্র ডাকে
মুক্তিসেনা যুদ্ধ করে
তখন ঝাঁকে ঝাঁকে।
স্বাধীন বাংলা গড়ার জন্য
অনেক কষ্ট সয়
অনেক রক্তের বিনিময়ে
দেশটা স্বাধীন হয়।
খোকন সোনা সেই ছেলেটির
বঙ্গবন্ধু খ্যাতি
চিরদিনই রাখবে স্মরণ
বীর বাঙালি জাতি।

ভাষা আন্দোলনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সংগঠিত ভাষা আন্দোলনে অসংখ্য নারী-পুরুষ যোগ দিয়েছিলেন। এমননি একজন অগ্নিপুরুষ ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রথম যে নির্ভীক ব্যক্তি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনের সকল কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও করার দাবি উত্থাপন করেন। সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮৬ সালের ২রা নভেম্বর বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার (তৎকালীন ত্রিপুরা) ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার রামরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবন শুরুতে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯১০ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯১১ সালে তিনি কুমিল্লা বারে যোগ দেন। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং কারাগারে আটক ছিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালের নতুন ভারত শাসন আইনে ১৯৩৭ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে জয়লাভ করে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনেও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কংগ্রেস দলের হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ধর্মেরভিত্তিতে ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাগ অনিবার্য হয়ে গেলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি জন্মভূমি ও দেশের মাটির সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেননি। না করার ফলে তাঁকে প্রায়ই জেলে যেতে হয়েছে, গৃহবন্দিও থেকেছেন একাধিকবার। তবু তিনি দেশ ছাড়েননি। তাই হয়ত পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই নতুন এই দেশটির সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে তাঁকে নেওয়া হয় আইনগত খসড়া কাঠামো তৈরির জন্য। ১৯৫৪ সালে তিনি পাকিস্তান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৫৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন।

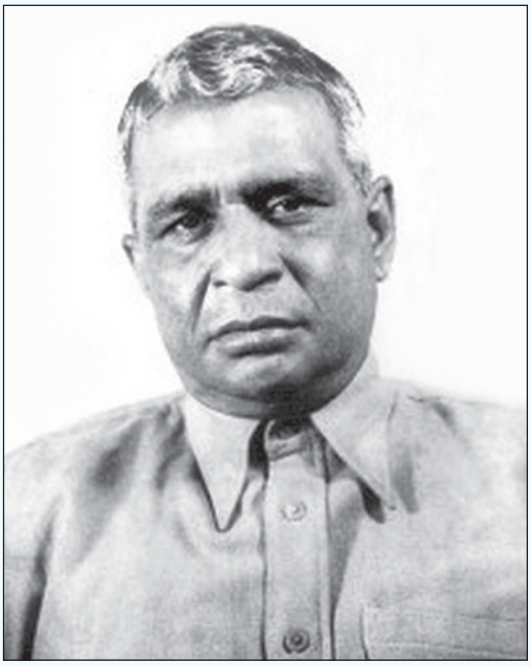

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পাকিস্তান সৃষ্টি হলে সংবিধান রচনার জন্য গঠিত হয় সংবিধান সভা, যা একইসঙ্গে পাকিস্তান গণপরিষদ হিসেবেও কাজ করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন করাচিতে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেই বিষয়েও আলোচনা চলছিল। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদের ব্যবহার্য ভাষা কী হবে, সে-সম্পর্কে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয় যে ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে থাকে। পাকিস্তান কৌশলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষার ওপর প্রথম আঘাত হানে। তারা বাঙালিদের মায়ের ভাষায় কথা বলাও বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ভাষা নিয়ে চাপা ক্ষোভ বাঙালির মধ্যে সেই ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই ছিল। তমদ্দুন মজলিস নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে? বাংলা নাকি উর্দু?' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও সমমর্যাদা দেওয়ার দাবি জানায়। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে অফিস-আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিককর্মীরা সোচ্চার হয়। এ দাবির প্রতিফলন ঘটে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি দাখিল করেন। মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, উর্দুর সাথে ইংরেজিও পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে বিবেচিত হবে। তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে ২৯নং বিধির ১নং উপ-বিধিতে উর্দু ও ইংরেজির পর 'বাংলা' শব্দটি যুক্ত করার দাবি জানান। তাঁর এই বক্তব্যকে জিন্নাহর 'উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণার প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ বলা যায়।

তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন, পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশের ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী। সুতরাং বিষয়টিকে প্রাদেশিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে দেখা উচিত। তাই তিনি গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবি করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবটিকে যুক্তিযুক্ত ভেবেছিলেন, কিন্তু শ্রী দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের পর তিনি এর মধ্যে এমন কিছু ষড়যন্ত্রের আভাষ পেলেন, যা পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, মোহাজের ও পুনর্বাসনমন্ত্রী গজনফর আলী খান, পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এবং গণপরিষদের সহ-সভাপতি তমিজউদ্দিন খান। তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলীম লীগ সদস্যরা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতাদের এসব বক্তব্যের জবাবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব সমর্থন করে গণপরিষদে কংগ্রেস দলের

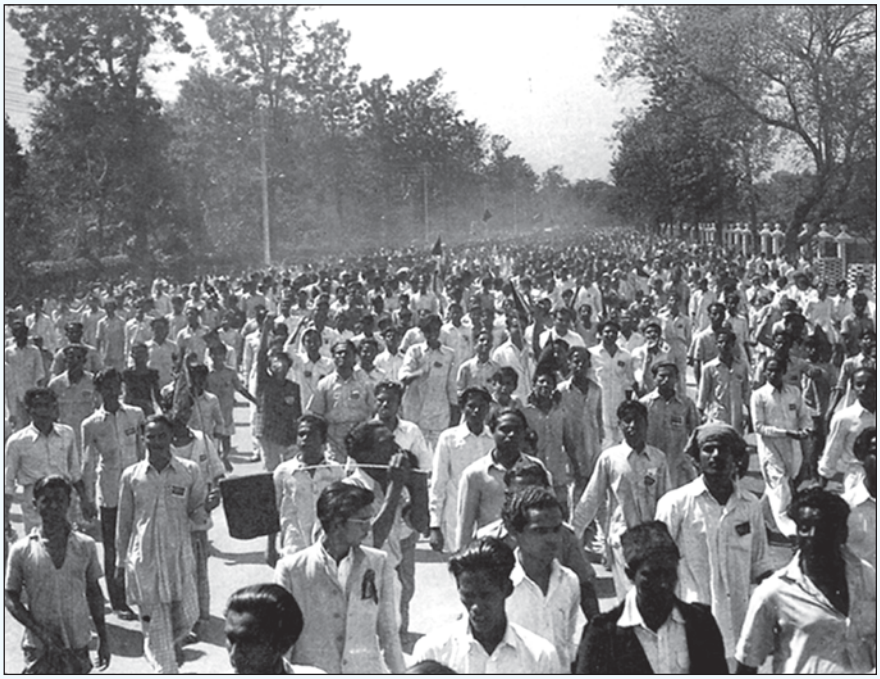

ভাষা আন্দোলনে জাগ্রত বাঙালি

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার দাবি সত্ত্বেও ১১ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা উর্দু বিল পাস হয়ে যায়।

১৯৫০ সালে গণপরিষদে আরবি হরফে বাংলা লিখার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে রক্ত ঝরে। ২২শে ফেব্রুয়ারি এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের অধিবেশন বয়কট করেন এবং এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারি নয়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সমগ্র পর্যায়টিতে পরিষদের অভ্যন্তরে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার সপক্ষে এবং ছাত্র ও সাধারণ মানুষের ওপর সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তৃতা করেন।

সেক্রেটারি রাজকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়। তা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরতলার কিছুসংখ্যক মানুষের ভাষা। আসলে এ হলো অন্যদের উপর উচ্চশ্রেণির আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্য চাপ দিচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি। ইংরেজিকে যদি সে মর্যাদা দেয়া হয়, তাহলে বাংলা ভাষাও সে মর্যাদার অধিকারী।'

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা বাংলা হওয়ার পরও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার নেপথ্যে যে দুরভিসন্ধি এবং ভাষিক আধিপত্যের পথ ধরে বাঙালি জাতিকে অবদমিত করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল তা সবার আগেই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পাকিস্তানের উর্দুভাষী আরোপিত ঐক্য নির্ভর ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মূলে কুঠারাঘাত ছিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ওই প্রস্তাব।

ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম; সর্বশেষ পাক হানাদারদের হাতে শহিদ হয়ে দেশপ্রেমিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের পাশাপাশি ব্যক্তি-পরিচয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেগুলো নিঃসন্দেহে আদর্শ অনুপ্রেরণা যুবসমাজ, রাজনীতিবিদ ও দেশবাসীর জন্যে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন। কুমিল্লায় তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা এবং কুমিল্লা স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয় 'ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম'।

বাংলা ভাষার মর্যাদা দাবি করেছিলেন দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও কৃতিসন্তান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ভাষাসৈনিক এবং মুক্তিসংগ্রামী। তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ভাষা আজ শুধু রাষ্ট্র ভাষাই নয়; ভাষা আন্দোলনের মহিমান্বিত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে এ দিবসটিও। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এ আন্দোলনের শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের ত্যাগ ও অবদানকে চিরস্মরণীয় করতে বর্তমান বাঙালিকে বাংলা ভাষা ব্যবহারে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। নিবেদিতপ্রাণ হয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহারে এবং এর মর্যাদাবৃদ্ধিতে কাজ করব– এই হোক আমাদের ব্রত।

ভাষা আন্দোলনে নারী ভাষা সৈনিকদের একটি মিছিল

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

মুজিববর্ষে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

আজহার মাহমুদ

বাংলার মানুষ এখন প্রহর গুণছে। অপেক্ষায় আছে পুরো বিশ্ব। লক্ষ্য একটাই 'মুজিববর্ষ'। বাঙালি জাতির হৃদয়ে যাঁর বসবাস, যাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পায় আগামী ১৭ই মার্চ তাঁর জন্মদিন। জন্মশতবর্ষ। যাঁর জন্য আমরা আজ সাজানো এই সোনার বাংলা দেখছি তাঁর জন্মশতবর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

যার জীবন-যৌবন সবকিছু এই বাংলার মানুষের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর জন্য আমরা কতটুকু করতে পেরেছি? তাঁর পরিবারের সদস্যদের জীবনও তিনি দেশের জন্য ত্যাগ করে দিয়েছেন। আজ তাঁর দুই মেয়ে রয়েছে। তাদের জন্যও তিনি কিছু চাননি। তাহলে আমরা তাঁর জন্য কি করতে পারি? আমরা তাঁর জন্য সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারি। তিনি চেয়েছেন একটি সোনার বাংলা। যেখানে থাকবে না কোনো অন্যায়, অপরাধ আর রাহাজানি। থাকবে সম্প্রীতি, মায়া, বন্ধন, ভালোবাসা আর একতা।

বঙ্গবন্ধু একজন আদর্শ। তাঁর দেখানো পথে যদি বাংলাদেশ চলতে পারে তাহলে এদেশ সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ দেশে পরিণত হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে আমাদের শপথ হতে হবে, দেশকে এগিয়ে নেওয়া। সকলে যেন অন্যায় এবং অনিয়মকে না বলি। অন্তত বঙ্গবন্ধুকে যারা ভালোবাসি, তাঁর প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল তারা যেন অন্তত অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকি। আমরা জানি মানুষ মাত্রই ভুল করবে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের এসব ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন– এটাও আমরা জানি। কিন্তু ভুল আর অপরাধ এক নয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছাড়াও আরও বেশ কিছু ভাষণ রয়েছে। সবখানেই তাঁর মুখে একটি কথা রয়েছে। সেটি হলো দেশ এবং দেশের মানুষের কথা। এদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধু সবসময় বিশ্বাস করেছেন। একটি ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আমি যখন জেলে ছিলাম তখন তোমরা আমার কথা রেখেছো, এখনও তোমরা আমার কথা রাখবা'। এই যে অগাধ বিশ্বাস, এটা একমাত্র আত্মার সম্পর্ক থাকার কারণে হয়। হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসার বন্ধন থাকলে এমনটা হয়। আর দেশের মানুষ তাঁর কথা রাখার কারণ হচ্ছে তাঁর প্রতি দেশের মানুষেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল। বঙ্গবন্ধুকে যারা কাছ থেকে দেখেছে তারা কখনো তাঁর বিপক্ষে কথা বলতে পারবে না। যারা দেশের এবং দেশের মানুষের বিপক্ষে ছিল, তারাই বঙ্গবন্ধুর শত্রু ছিল। সেই শত্রুরাই বঙ্গবন্ধুকে শহিদ করেছিল। ১৫ই আগস্টের ভয়ংকর সে রাতে বঙ্গবন্ধুর পুরো পরিবার হয়েছেন শহিদ। সন্তানরা যেমন পিতা হারিয়ে এলোমেলো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি দেশের মানুষ এবং দেশ হয়ে পড়েছিল সেদিন এলোমেলো। এলোমেলো এই দেশকে তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা আবার সোনার বাংলায় রূপান্তর করার চেষ্টা করছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন দেশনেত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই জানুয়ারি ২০২০ তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রতীকী মঞ্চায়ন এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

মুজিববর্ষে আমাদের সকল অনৈতিকতা ভুলে গিয়ে সুন্দর আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে শপথ করতে হবে। দুর্নীতি, ঘুষ, অপকর্ম, অনিয়মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে সত্য এবং সততার পথে চলতে হবে। তবেই মুজিববর্ষের সার্থকতা হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের ৮ ধাপ অগ্রগতি

শুক্লা সরকার

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সবক্ষেত্রের উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক মুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এ বছর বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের ৮ ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। স্বনামধন্য ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) প্রকাশিত গণতন্ত্র সূচকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিশ্বের ১৬৫টি দেশ ও দুটি ভূখণ্ডের এই সূচকে ২০১৯ সালে ৮৮তম অবস্থানে থাকলেও ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ৮০তম। মূল্যায়নের ১০ পয়েন্টের মধ্যে এবার বাংলাদেশের স্কোর ৫.৮৮। ২০১৯ সালে এই স্কোর ছিল ৫ দশমিক ৫৭। তার আগের বছর ছিল ৫ দশমিক ৪৩। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবনমন ঘটেছে ব্যাপক। ২০১৯ সালে দেশটি ৭.২৩ স্কোর নিয়ে তালিকায় ৪১তম থাকলেও এবার ৫১তম অবস্থানে নেমে এসেছে। ২০২০ সালে ভারতের স্কোর ৬.৯০। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কা ৬.১৯ স্কোর নিয়ে ২০১৯ সালে ৭১তম অবস্থানে থাকলেও এবার দেশটির দুই ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। শ্রীলঙ্কা ২০২০ সালে ৬.২৭ স্কোর নিয়ে ৬৯তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ৪ দশমিক ১৭ স্কোর নিয়ে পাকিস্তান ২০১৯ সালে ১১২তম হলেও এবার ৪.২৫ স্কোর নিয়ে ১০৮তম অবস্থানে রয়েছে দেশটি। ইআইইউ'র এই সূচকে এবারো ৯.৮৭ স্কোর নিয়ে শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে। এরপরই ৯.৫৮ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আইসল্যান্ড। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইডেন ৯.৩৯ স্কোর নিয়ে, চতুর্থ নিউজিল্যান্ড স্কোর ৯.২৬, পঞ্চম ফিনল্যান্ড স্কোর ৯.২৫।

বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে এ বছর একেবারে তলানিতে কার্যত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন উত্তর কোরিয়া। দেশটি ১.০৮ স্কোর নিয়ে ১৬৭তম অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো ১৬৬তম, স্কোর ১.১৩ সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ১৬৫তম, স্কোর ১.৩২ সিরিয়া ১৬৪তম, স্কোর ১.৪৩। ইআইইউ বলছে, বিশ্বের মাত্র ২২টি দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র রয়েছে, যেখানে প্রায় ৪৩০ মিলিয়ন মানুষের বসবাস (এছাড়া বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এখনো কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার অধীনে তাদের জীবন অতিবাহিত করছে।

যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক এ সাময়িকীর গবেষণা শাখা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ২০০৬ সাল থেকে এই সূচক প্রকাশ করে আসছে। ৫টি মানদণ্ডে একটি দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১০ পয়েন্টের এই সূচক তৈরি করে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। এগুলো হলো– নির্বাচন ব্যবস্থা ও বহুদলীয় পরিস্থিতি, সরকারের সক্রিয়তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং নাগরিক অধিকার। প্রতি সূচকের পূর্ণমান ধরা হয় ২। সব সূচক মিলিয়ে কোনো দেশের গড় স্কোর ৮-এর বেশি হলে সেই দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। স্কোর ৬ থেকে ৮-এর মধ্যে হলে সেটাকে চিহ্নিত করা হয় ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র হিসেবে, আর স্কোর ৪ থেকে ৬-এর মধ্যে হলে মিশ্র শাসন (হাইব্রিড রেজিম) ধরে নেওয়া হয়। যদি স্কোর ৪-এর নিচে হয় তাহলে সে দেশে স্বৈরশাসন চলছে বলে ধরা হয়।

বর্তমানে শেখ হাসিনার সরকার দেশে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ কিংবা জন্মস্থানভিত্তিক সকল বৈষম্য নিরসনে কাজ করছে।

১৩ই জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল–পিআইডি

রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার বন্ধ করা, বিদ্বেষ দূরীকরণ, তৃতীয় লিঙ্গসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, নাগরিক অধিকার ও সুবিধা জনগণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ সক্রিয় দায়িত্ব পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ প্রশ্নোত্তর পর্বে নিয়মিত অংশগ্রহণ ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংসদে প্রাণবন্ত আলোচনা করছেন।

দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের সকল জাতীয় ও স্থানীয় সংসদের স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। এছাড়া দশম জাতীয় সংসদ সদস্য থাকাকালীন সাবের হোসেন চৌধুরী বিশ্বের সকল সংসদের স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের দশম সংসদ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি গণতান্ত্রিক বিশ্বের অবিচল আস্থার এ ছিল এক অভূতপূর্ব নিদর্শন।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শহিদমিনার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

ভাষার মুক্তি ও আমাদের চেতনা

রহিমা আক্তার মৌ

সবগুলো পত্রিকা ঘরে না আনলেও সাহিত্য সাময়িকীগুলো ঠিক সময়ে নিয়ে আসি। পাঠক তিন বয়সি মা মেয়ে তিনজন। পড়তে পড়তে আজ তিনজনেই একটু লিখতে শিখেছি। সাহিত্য পাতায় 'ফোন' নামে একটা গল্প পড়লাম। প্রথম থেকে গল্পটার প্রতি খুব আকর্ষণ না থাকলেও মাঝ পথে টান বেড়ে যায়। শেষটুকু পড়ে খুব অট্টহাসি দিই। পাশের রুম থেকে দৌড়ে এল অভ্র, ও এবার ৯ম শ্রেণিতে পড়ে।

– মা এত জোরে হাসলে যে।

এসে দেখে পত্রিকাটি এখনো হাতে। ওকে গল্পের সারমর্ম বললাম, এটা আমাদের তিন জনের অভ্যাস। আমার সারমর্ম শেষ হবার সাথে সাথে ও বলতে লাগল ...

– জানো মা আজ ক্লাসে একটা মেয়ে আমাকে গল্প শোনালো, গল্পটা ভালো ছিল তবে আমি মজা পাইনি। কারণ গল্প বলতে গিয়ে মেয়েটি অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করল। যা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। অসহ্য, বাংলা গল্প বলছে অথচ মাঝে মাঝেই ইংরেজি শব্দ, তুমিই বল এটা কি ঠিক।

ওর কথার কোনো জবাব আমার কাছে সে মুহূর্তে ছিল না। কিছুটা অভিনয় করে পাশ কেটে গেলাম। একজন সাধারণ বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে আমি বাংলাকেই হৃদয়ে লালন করি। বাংলায় মনের কথা প্রকাশ করি, মা কে মা বলে ডাকি আর বাবাকে বাবা বলে। সন্তানকে অ আ ই ঈ দিয়ে মুখের বুলি শিখাই, মাতৃভাষার আকুতি ভরা ডাকে সন্তানের মুখে 'মা' ডাক শুনি। প্রয়োজনে ওদের ভিনদেশি ভাষা শিখাই, মাতৃভাষা বাংলার গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াই। এই ভাষা আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন। এটা প্রতিটি কাজে নিজে যেমন বুঝি অন্যকেও বুঝাই। চলছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি, চারপাশে বাংলা ভাষাকে নিয়ে চলছে অনেক আলোচনা, সমাবেশ ও বইমেলা। বইমেলা যেন ভাষার মেলা, বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করে নেওয়ার মেলা।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদে এ উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। হিন্দু মুসলমানদের জনসংখ্যার নিরিখে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয় দুটি অংশে– ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার আগেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়। বাংলা ভাষাকে অর্জনের জন্য বাঙালি জাতির এক অসাম্প্রদায়িক সহিষ্ণু চেতনার পথে লড়াই শুরু হয় এভাবেই। যার অর্জন আসে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের ১৪৪ ধারা ভেঙে রাজপথে ছাত্র-জনতা নামার ফলে। পিচঢালা রাস্তায় শহিদের রক্তের বিনিময়ে, আজ ওরা আমাদের ভাষা শহিদ। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার আগেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বির্তক শুরু হয়। উর্দুর পক্ষে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে বাঙালির ভাষা সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটান আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জিয়াউদ্দিন আহমদ। তার বক্তব্যের লিখিত প্রতিবাদ জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

'বাংলা না উর্দু' শিরোনামে পুস্তিকা প্রকাশ করে তমদ্দুন মজলিস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম ছিলেন সেই মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর করাচিতে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সংবাদটি পূর্ব বাংলায় পৌছামাত্র দেখা দেয় এক তীব্র প্রতিক্রিয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মরণে ১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবস

প্রতিবছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে ১লা মার্চ দিনটিকে বীমা দিবসের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ১৩ই জানুয়ারি এ দিবসটি অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এছাড়া ২রা মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস পালনের বিষয়টিও অনুমোদন দিয়েছে সরকার। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বৈঠক সম্পর্কে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেন। আর তাই এ দিনটিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। তিনি বলেন, বীমা সম্পর্কে ভালো করে জানাতে, বিভিন্ন ধরনের বীমার সুবিধা যাতে মানুষ পায় সেজন্যই এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মোহাম্মদ হোসেন

এদিন দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম প্রতিবাদ সভা। সভা শেষে একটি মিছিল পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী থাকা নাজিম উদ্দীনের বাসভবন বর্ধমান হাউস এবং মুসলিম লীগের মুখপাত্র-এর অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন আহ্বায়ক হন ছাত্র নেতা শামসুল হক। এ দিনই ঘোষণা করা হয় ১১ই মার্চ দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও সাধারণ ধর্মঘটের। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্রে গণপরিষদে মুসলিম লীগ নেতাদের অবিশ্বাসের প্রতিবাদ ছিল এ ধর্মঘট। সেভাবে পাকিস্তান গণপরিষদের ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা শহরের ছাত্র-সমাজ ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে প্রথম রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করে।

বাংলাভাষার দাবি এইভাবে রাজপথ জনপথে আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ নেয়। ঐদিন ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ, ঘনঘন ফাঁকাগুলি ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং ভাড়াটে গুন্ডাদের আক্রমণে বহু ছাত্র আহত হয়। সরকারি দমন নীতির ফলে অবশ্য ছাত্ররা দমে যায়নি বা আন্দোলনে কোনো প্রকার ভাটা পড়েনি। ছাত্ররা প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের সামনে, বর্ধমান হাউসে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারি বাস ভবনে, হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েটের সামনে প্রতিদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত রাখে। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল ও শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদকে তাদের পদত্যাগ পত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত এই বিক্ষোভ দমন করার জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হয়। পূর্ব প্যাকিস্তানের তদানীন্তন জিওসি ব্রিগেডিয়ার আইয়ুব খানের নির্দেশে মেজর পীর জাদা একদল পদাতিক সৈন্য নিয়ে ছাত্র দ্বারা ঘেরাও পরিষদ ভবন থেকে খাজা নাজিম উদ্দিনকে পশ্চাৎ দ্বারা এবং বাবুর্চি খানার মধ্য দিয়ে বাইরে পাচার করে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ নেয় ১৯৪৭ সালের ১১ই মার্চ, আন্দোলন প্রথম সপ্তাহেই এমন ব্যাপকতা লাভ করে যে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সেই চুক্তিপত্রে ছিল– ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে। আন্দোলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

২৯শে ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যে-দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

ঐ চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হবার আগে সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে বন্দি ছাত্রনেতা শামসুল হক, শওকত আলি, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব ও শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখিয়ে চুক্তিপত্রটি অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আসেন। ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় বন্দি ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ জিন্নাহ ঢাকার রমনার ঘোড়-দৌড় ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ঘোষণা করেন ...

'এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোনো ভাষা নয়। যদি আপনাদের কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্ট করে সে হবে পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু। একটি রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও টিকে থাকতে পারে না। ... সুতরাং রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।

২৪শে মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন ভাষণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবারও সেই বক্তব্য পেশ করে। পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ওই ঘোষণা সভা ও সমাবর্তনে উপস্থিত ছাত্রদের প্রতিবাদসূচক 'না' ধ্বনি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ২৪শে মার্চ ভাষা আন্দোলনের নেতা শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাশেম, তাজউদ্দীন আহমদ, নইমুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও অলি আহাদ সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি দল জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে এই স্মারক লিপি দেন। জিন্নাহ এই দাবি অগ্রাহ্য করে।

১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি গঠিত হয়েছিল। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০-এ পেশকৃত ঐ কমিটির রিপোর্টে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র করার সুপারিশ ছিল। সেদিন মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির অগণতান্ত্রিক এবং পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক রিপোর্ট

পূর্ববাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ই নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত এক জাতীয় মহা-সম্মেলনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য যে পাল্টা সুপারিশসমূহ পেশ করা হয় তাতে বলা হয়েছিল– 'পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু'।

১৯৫১ সালের ১৬ ও ১৭ই মার্চ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান, কারণ তা তাঁর মতে বাঙালিদের গণহত্যার শামিল। '৫২-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এরপর ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সঙ্গে পতাকা দিবস পালন করা হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি সম্বলিত ব্যাজ বিক্রয় আর ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহের নামে ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে। একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ সরকারের বাজেট অধিবেশন। জনতার আন্দোলনে ভীত সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মাসের জন্য ঢাকা জেলাতে ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে।

সরকারের এই হটকারী নির্দেশ সমগ্র ঢাকায়, প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালু রাখার। তবে এরমধ্যে বিরোধিতাও করে কেউ কেউ। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার সব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে এসে জড়ো হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। গাজীউল হকের সভাপতিত্ব এক সভা শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিষয়ে চূড়ান্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেয় ছাত্রদের হাতে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়।

সভা থেকে ১০ জন করে দল গঠন করে মিছিল নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে কলা ভবনের গেট দিয়ে বের হতে থাকে। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে ও গণগ্রেফতার শুরু করে। প্রায় ২ ঘণ্টা এমন হওয়ার পর ছাত্ররাও ইট পাটকেল ছুঁড়ে পুলিশের মোকাবিলা করে। পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহিদ হন। আহত হয় অনেকে। আহতদের মধ্য থেকে রাত ৮টায় শহিদ হন আবদুল বরকত। সে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র। ২২ তারিখে গায়েবানা জানাজার পর প্রতিবাদ মিছিল শুরু হলে সেখানেও পুলিশের গুলিবর্ষণ হয় তখন শহিদ হন শফিউর রহমান। ২৩ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের পাশে নিজেরাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলে।

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে। ভাষার মাস এলেই যেন বাঙালি তার প্রকৃত রূপধারণ করে। ভাষা যেভাবে মুক্তি পেয়েছে সেভাবে চেতনাকে অক্ষুণ্ন রেখে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করবে বাঙালি আর সমুন্নত রাখবে মাতৃভাষার সব অহংকারকে।

লেখক: সাহিত্যিক ও কলামিস্ট

বান্দরবানে মুজিববর্ষ কাউন্টডাউন ঘড়ি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশের মতো পার্বত্য জেলা বান্দরবানেও ঘোষিত মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য ক্ষণগণনা শুরু করা হয়েছে। এজন্য সদরের জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের মূল ফটকে একটি কাউন্টডাউন ঘড়ি স্থাপন করেছে বান্দরবান জেলা প্রশাসন।

বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১০ই জানুয়ারি চলতি মাসের তথা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস থেকে এ মুজিববর্ষের কাউন্টডাউন শুরু করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত বর্ষটি সারা দেশে একযোগে উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জনগণকে দিবসটি সম্পর্কে জানাতে জনবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ক্ষণগণনার ঘড়িটি স্থাপন করা হয়েছে।

বান্দরবানের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শামীম হোসেন জানান, আগামীকাল বিকাল ৩টায় বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সম্প্রীতির মুক্তমঞ্চে অতিথিদের আসন গ্রহণ এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয়ভাবে দিবসটির উদ্‌বোধনের পরপরই বান্দরবানে অতিথিদের নিয়ে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে স্থানীয়ভাবে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

রক্তের শহিদ স্মৃতি

হাসান হাফিজ

মাতৃভাষার জন্যে লড়াই ঋণ শুধেছি রক্তধারায়
এমন গর্ব এমন অহং কক্ষনো কি পথ সে হারায়?
প্রাণের মূল্যে মায়ের ভাষা মর্যাদা পায় সুস্থিতি পায়
বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি ঢেউ ছোট্ট দেশের এই আঙ্গিনায়।
স্বাধীনতা এক উড়াল পাখি
ডানায় উজল মুক্তি আঁকা
রক্ত আখর সৃজন করে
তোমার সত্তা অহংভূমি
স্বাধীনতা এক সুরেলা গাঙ
মনোগহিন ইচ্ছাপূরণ
শৃঙ্খল সব ভেঙেচুরে আনন্দগান শব্দসাধন...
মুক্তিনাচন আলোয় আলোয়...
স্বাধীনতা এক ঝড়ের স্মৃতি
বানকুড়ালি নেয় উড়িয়ে
অনেক তাজা প্রাণের মূল্য
তাইতো স্বাধীনতা তোমায়
রক্তঋণের অভিলাষের
মুগ্ধ প্রণয় ধারণ করি
শহিদ স্মৃতি লালন করি...

আলোর পথে

বাতেন বাহার

একটি শিশু রৌদ্রে পুড়ে উড়ায় শুধু ঘুড়ি
ভাতের থালা সরিয়ে রেখে, খায় পিয়াজু মুড়ি।
তারজন্য মা ও বাবার নেই ভাবনার শেষ
কেমন করে করবে তাকে সুবোধ অবশেষ?
আরেক শিশু পড়তে না তো আঁকতে বাসে ভালো
তাকে নিয়েও চিন্তা করে মুখটি বাবার কালো।
একদিন মা রঙতুলিও কিনে রঙিন ঘুড়ি
বলল-খোকা, আয়রে তোরা-আয় স্বপনে উড়ি।
উড়িয়ে ঘুড়ি যে খাস মুড়ি মন দিয়ে তুই শোন
তোর ঘুড়িতে আঁকবে ছবি তোরই ছোটো বোন।
বোনের সাথে ভাই আঁকবে মজার ছবি শত
সেই খুশিতে ঘুড়িও ঠিক উড়বে মনের মতো।
যার বুকেতে বাঘের ছবি- বাঘ ঘুড়ি তার নাম
সাপ থাকলে সাপ ঘুড়ি সে- অনেক বেশি দাম।
থাকলে পাখি ময়না টিয়ে উড়বে রে পত্ পত্
ছিড়লে সুতো দূর আকাশে খুঁজবে পরীর রথ।
উড়িয়ে ঘুড়ি সন্ধ্যেবেলা ভাই ভগ্নি নিয়ে
ঘুড়ির বুকে আঁকবি ছবি রঙ ও তুলি দিয়ে।
লাল সবুজে মা'র পতাকা, আঁকবি ছবি মা'র
আঁকবি অ আ ... এ নাম ধরে ডাকবি বারংবার।
ইংরেজিতে আঁকবি আরো এ বি সি ডি আর
দেখবে সবে ঘুড়ির বুকে নিখুঁত ছবি কার।
ঘুড়িতে যার নিখুঁত ছবি রঙের কারুকাজ
বাসবে ভালো সবাই তাকে পরিয়ে জয়ের তাজ।
মায়ের কথা শেষ না হতে বলল দু'ভাই মিলে
নিখুঁত ছবি এঁকেই তারা উড়বে আকাশ নীলে।
ভাষার ছবি আশার ছবি আঁকবে রীতিমতো
আলোর পথে হাঁটবে তারা আসুক বাঁধা যত।

আগুন ঝরা ফাগুন

মিয়াজান কবির

বাংলা ভাষায় কথা কইতে রফিক হইল খুন,
সেই শোকেতে মনে জ্বলে ক্ষোভেরই আগুন।
তেরোশ আটান্ন সালে
ভাষার তরে মিছিল কালে
চালায় গুলি– উড়ায় খুলি
আটই ফাগুন।
কুহুকুহু কাঁদে পাখি
বেদনাতে ঝরে আঁখি
ব্যথার সুরে প্রজাপতি
করে গুনগুন।
আগুন ঝরা ফাগুন ক্ষণে
পলাশ ফোটা সবুজ বনে
ডালে ডালে জ্বলে
ভোরের রাঙা অরুণ।

বর্ণমালার বিমান নিয়ে একুশ এল

বাবুল তালুকদার

বর্ণমালার বিমান নিয়ে একুশ এল
যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে শহিদ হলো
রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, সালাম।
ভাষা পেলাম, রাষ্ট্র পেলাম
মা ও মাটির দেশ পেলাম।
লাল-সবুজের বৃত্তে ঘেরা
স্বাধীনতার পতাকা পেলাম, বাংলা পেলাম।
বজ্রকণ্ঠের নেতা পেলাম
শেখ মুজিবের হুকুম পেলাম, ভালোবাসা আদর পেলাম।
যুদ্ধ জয়ের পদক পেলাম
পাকসেনাদের তাড়িয়ে দিলাম।
সারা বিশ্ব কাঁপিয়ে দিলাম, জানিয়ে দিলাম
স্বাধীন একটি দেশ পেলাম।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা পেলাম
বীর খেতাবের প্রতীক পেলাম।
বীরশ্রেষ্ঠ, বীর বিক্রম,
বীর উত্তম, বীর প্রতীক।
সারা বিশ্বে জয়ের ধ্বনি
বিজয় স্বাধীন দেশ
জাতির পিতার বাংলাদেশ।

তুমি শুধু

শাহনাজ

সাতজন্মে আমার বিশ্বাস নেই
এক জন্মে সবটা চাই। ইতিহাসের পাতায় নয়
নয় মিথ; শুধু একটা হৃদয়ে আঁকিবুকি
টেনে জলপাই রঙের রাজহাঁস হবো আমি
নীল লেকের পানিতে,স্বচ্ছতা গায়ে মেখে।
কত হাহাকার, কত কান্না এক জীবনের
কিছুটা সুখ, কিছুটা বিশ্বাস
শুধুই তোমাকে দিলাম।

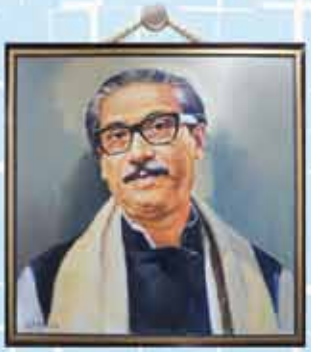

একটি অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ

শামস সাইদ

সাত মাস এগারো দিন পরে বাড়িতে ফিরেছে রিফাত। সাথে মা। বাবা এখনো ফেরেনি। দাদুর খবর জানতে পারেনি। বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। মায়ের চোখ-মুখ শুকিয়ে কাট। ঘরের দরজা খোলা। জানালা ভাঙা। ঘরের ভেতর ঢোকার সাহস পাচ্ছে না। উঠানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন মা।

রিফাতের বাবা মুক্তিযুদ্ধে গেছেন। তার কিছু দিন পরে এক গভীর রাতে দাদুকে ধরে নিয়ে গেল পাকিস্তানি বাহিনী। পরদিন রিফাতকে নিয়ে মা চলে গেলেন বাবার বাড়ি। সেখানেও দিন রাত ভয় আর উৎকণ্ঠা জড়িয়েছিল তাদের। রাতে কেউ বাড়িতে ঘুমায়নি। আশ্রয় নিত বাড়ির পেছনের বাগানে। কেউ গাছে উঠে বসে থাকত। ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকত। রিফাতের এসব ভালো লাগত। কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চার ভাব আছে। সঙ্গে থাকত মামাত ভাই শাহিন। সন্ধ্যা নামলেই সবার মুখ অন্যরকম হয়ে যেত। ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যেত বাগানে। মা, নানি সবাই চলে আসত। হোগলা বিছিয়ে বসে থাকত। গল্প করত। শাহিনকে নিয়ে রিফাত চলে যেত বাগানের আরো ভেতরে। ঝিঁঝি পোকা ধরত। ফিসফিস করে কথা বলত। কেউ যেন না শোনে। নানি টুক টুক করে বাঁশের কৌটায় পান কুটত। নানিকে ভয় দেখানোর জন্য দূরে গিয়ে শিস দিত রিফাত। আবার ঢিল ছুড়ে মারত। সবাই ভয়ে জমে খিড়। হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়াত রিফাত।

কখনো আবার ছুটে এসে বসে পড়ত নানির সামনে। গল্প শুনবে। দেশে যুদ্ধ হচ্ছে কেন? এভাবে কতদিন পালিয়ে থাকব? বাবা কবে বাড়ি ফিরবে? দাদুর খবর নাই। কোথায় গেছে? কারা নিয়ে গেছে। নানি বলেন সেই গল্প। কেন যুদ্ধ হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর কথা শুনে থামিয়ে দিল রিফাত। কে এই বঙ্গবন্ধু? সবাই কেন তাঁর কথায় যুদ্ধে গেল?

– মা বললেন, তুই বঙ্গবন্ধুকে চিনিস না?

– কীভাবে চিনব? আমি তো কখনো দেখিনি। কথাও হয়নি তাঁর সাথে।

– কথা না হলেও দেখেছিস তুই।

– কোথায় দেখলাম? আমি তো কখনো বঙ্গবন্ধুর কাছে যাইনি।

– আমাদের বাড়িতে দেখেছিস। তোর দাদুর সাথে। সামনের ঘরে ঝুলানো। দেখিস নাই ওই ছবিটা? উনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। মোটা ফ্রেমে কালো চশমা পরা।

রিফাত কিছুক্ষণ ভাবে। খুব চেষ্টা করে মনে করতে। ওই ছবিটা কল্পনায় আনতে। দাদুর ছবিটাই ভেসে ওঠে। পাশেরটা দেখে না। তখন কেমন ঘোলাটে হয়ে যায় চোখ। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও পারল না। ওভাবে কখনো খেয়াল করেনি। দেখার কৌতূহল তৈরি হয়নি। এখন কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বাড়ি ফিরেই দেখবে ছবিটা। বঙ্গবন্ধু তাদের ঘরে আছে। সে দেখে নাই। এটা অন্যায়। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। যুদ্ধ আর থামছে না। কত ঘটনা ঘটে গেছে। কত মানুষ ধরে নিয়ে গেছে। মরা মানুষের লাশ ভাসছে খালে। এসব দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে রিফাত। ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। ভুলে গেছে হাসতে। হঠাৎ একদিন সব ভয়-উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। শত্রুরা হেরে গেছে। নেমে এল বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাস। শাহিনকে নিয়ে দৌড়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় চলে এল রিফাত। পতাকা নিয়ে মিছিল বের করল। গ্রামের পথে ঘুরে এসেছে বড়দের সাথে। হই হই করল আনন্দে। পতাকা উড়াল বাড়ির সামনে। বাঁশের মাথায়। ছুটে এসে মাকে বলল, এবার বাড়ি চলো। আর কোনো ভয় নাই। ওরা হেরে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। রিফাতের মনে পড়ল সেই ছবির কথা। বঙ্গবন্ধুকে দেখবে সে। এই ছবি অস্থিরতা আরো বড়িয়ে দিল।

বাড়িতে যাওয়া যাবে না। তোর বাবা আসুক। কোথায় তোর দাদু কিছুই জানি না। মা বললেন।

রিফাত অস্থির। আজই সে বাড়িতে যাবে। বলল, দাদুর চিন্তা করো না। কাল শাহিনকে নিয়ে বের হব আমি। দাদুকে খুঁজে নিয়ে আসব। বাবা মনে হচ্ছে অনেক দূরে যুদ্ধে গেছে। আসতে সময় লাগবে। হেঁটেই আসতে হবে। রাস্তাঘাট ভেঙে ফেলেছে ওরা। গাড়ি ঘোড়া নাই।

মা হাসলেন। তুই পারবি না রিফাত। তোর দাদু কোথায় আছেন জানি না। আমরা কয়েকদিন পরে বাড়িতে যাব।

স্বাধীনতা লাভের দিন কুড়ি পরে রিফাতকে নিয়ে বাড়িতে ফিরল মা। দেখল ঘরের অবস্থা এরকম। সেই ছবিটা দেখার জন্য মন আকুবাকু করছে রিফাতের। কোন মানুষটা বঙ্গবন্ধু। কেন সে এতদিন দেখল না। মাকে রেখে ঘরের দিকে হাঁটল রিফাত। ঘরটা একটা ধ্বংসস্তুপ। মালপত্র নিয়ে গেছে। বাকি সব ভেঙে তছনছ করে রেখে গেছে। সেসব ডিঙিয়ে রিফাত সামনের ঘরের উত্তর পাশে গেল। এখানে দাদু থাকত। খাটের উপর ঝুলত সেই ছবিটা। ছবিটা নাই। কোথায় গেল? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল। মা এসে পেছনে দাঁড়ালেন। দেখলেন রিফাতের মন খারাপ। কেমন দুঃখ এসে জড়ো হয়েছে ওর মুখে। রিফাত তাকাল মায়ের দিকে। জানতে চাইল সেই ছবিটা কোথায়? দেখছি না যে মা।

– কোন ছবির কথা বলছিস?

– ওই যে দাদুর সাথে বঙ্গবন্ধুর ছবি।

মায়ের চোখ গেল উপরের চৌকাঠে। ছবিটা এখানেই ঝুলানো ছিল। দেখছেন না। খানিক ভেবে বললেন, এখানেই তো ছিল। হয়তো ওরা নিয়ে গেছে।

– কারা?

– যারা ঘরের এই অবস্থা করেছে।

দাদুর খাটের কাছে গেল রিফাত। তোষক-কাঁথা-বালিশ এলোমেলো পড়ে আছে। টেবিলটা উলটানো। চেয়ারটা কাত হয়ে পড়ে আছে। দাদুর বইগুলো ছড়ানো ছিটানো। সেসবের ভেতর আতিপাতি করে খুঁজল। ছবিটা তার চাই। বঙ্গবন্ধুকে দেখতেই হবে। হঠাৎ চোখ আটকে গেল রিফাতের। দেখল ছবিটা চাপা পড়ে আছে বালিশের নিচে। মাথা নিচু করে তুলল। গ্লাসটা ভেঙে গেছে। চোখের সামনে ধরেই ফিক করে হেসে উঠল। তাকাল মায়ের দিকে। এই তো সেই ছবি। আবার ছবিতে মুখ দিল। দেখল দাদুর পাশের ছবিটা। এই বঙ্গবন্ধু! গভীর দৃষ্টিতে দেখছে। মগ্ন হয়ে। এরপর মাথা তুলল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ছবি দেখব না। একদিন বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যাব আমি। সামনে দাঁড়িয়ে দেখব। বলব বঙ্গবন্ধু, আমার দাদুর সাথে আপনার ছবি আছে।

এক রাতে বাড়ি ফিরল বাবা। যোদ্ধার বেশে। বাবার দাড়ি চুল লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। দাদু তখনো ফেরেনি। রিফাত দাদুকে ফিরে পেতে চায়। দাদুর কাছে শুনবে বঙ্গবন্ধুর গল্প। দাদুকে নিয়ে যাবে বঙ্গবন্ধুর কাছে। কিন্তু দাদু ফেরে না। বাবা বের হলেন দাদুর খোঁজে। বেশিক্ষণ লাগেনি খোঁজ পেতে। বিকেলে ফিরে এসে খবর দিলেন বাবা ফিরবেন না। ওরা মেরে ফেলেছে। লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রিফাত খুব কান্না করল। দাদু আর ফিরবে না। এটা সে মানতে পারছে না। কান্না এক সময় থামল। কিন্তু মন থেকে দাদু আর বঙ্গবন্ধু গেল না। বঙ্গবন্ধুর কাছে সে যাবে। বলবে তার দাদুর কথা। যাকে শত্রুরা মেরে ফেলেছে। এরপর অনেক দিন কেটে গেল। স্কুলে ভর্তি হলো রিফাত। দাদুর কথাও ভুলে গেছে। ভুলে গেছে বঙ্গবন্ধুর কথা। হঠাৎ একদিন শুনল বঙ্গবন্ধু আসবেন তাদের এলাকায়। রিফাতের আবার মনে হলো বঙ্গবন্ধুর কথা। মনে হলো দাদুর কথা। সেই ছবির কথা। বন্ধুদের কাছে গল্প করল। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার দাদুর ছবি আছে। দাদুও বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি করত। এরপর বলল সে যাবে বঙ্গবন্ধুর কাছে। ছবিতে নয়, সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে। ছবি তুলবে। বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করল। বঙ্গবন্ধুর কাছে কীভাবে যাওয়া যায়?

বন্ধুরা অবাক চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কী বলে রিফাত। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যাবে। তাঁর সাথে দেখা করা কী মুখের কথা। তিনি হলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। কত কত পুলিশ থাকেন তাঁর সাথে। গেটেই তো আটকে দেবে।

রিফাতের মাথায়ও এই চিন্তাটা ভর করল। খুব সহজ হবে না দেখা করা। তবু সে যাবে। গেটে আটকে দিলে অন্য ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধুর চোখে পড়লে ফিরে আসতে হবে না। দেখা করতে পারবে। তার দাদুর নাম শুনলে ঠিক কাছে টেনে নেবে। আদর করবে।

বন্ধুরা বিশ্বাস করল না। তোর দাদুকে বঙ্গবন্ধু চিনতেন?

চিনতেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে দাদুর ছবি আছে। বিশ্বাস না হলে আমাদের বাড়িতে চল। দেখাব।

তখন বন্ধুরা কিছু বলল না। দুদিন পরেই বঙ্গবন্ধু এলেন সিলেটে। বিশাল জনসভা করলেন সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে। যুদ্ধ ফেরত হাজার হাজার মানুষ সেখানে হাজির হলো। সবাই দেখতে চায় বঙ্গবন্ধুকে। শুনতে চায় তাঁর কথা। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করলেন। বললেন, তাঁর স্বপ্নের কথা। দীর্ঘদিনের স্বপ্নের ফসল স্বাধীন বাংলার কথা। সেই হাজার হাজার মানুষের জনসভায় দাঁড়িয়ে আছে রিফাত। পাশে বন্ধুরা। দূরে দাঁড়িয়ে ছবির মতো দেখছে বঙ্গবন্ধুকে। মানুষের ভিড় ঠেলে যেতে পারছে না সামনে। সভা শেষে মানুষের ছোটাছুটিতে হারিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুকে আর দেখতে পারল না। কোথায় গেছেন বঙ্গবন্ধু তা জানে না। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরল। দাঁড়াল সেই ছবির সামনে। তখন খুব কান্না পেল। বঙ্গবন্ধুকে এত কাছে পেয়ে সামনে যেতে পারল না। আজ না পারলেও একদিন সে যাবে। বঙ্গবন্ধুর সামনে দাঁড়াবে। রাতে ঘুম নামল না চোখে। হাজারটা প্ল্যান মাথায় কিলবিল করছে। কীভাবে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়া যায়।

পরদিন স্কুলে এল রিফাত। শুনল বঙ্গবন্ধু যাননি। সার্কিট হাউসে আছেন। এই সুযোগ হাত ছাড়া করতে চায় না সে। বন্ধুদের বলল, বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব।

বন্ধুরা বলল, পুলিশ আছে। ভেতরে ঢুকতে দেবে না। গেটে আটকে দেবে। অযাথা গিয়ে কী করবি। বড়ো হয়ে দেখা করতে যাব। রিফাত মানল না। সে যাবে। বলল, তোরা যাবি কি-না সেটা বল।

যাব কীভাবে? স্যার দেখলে পিঠে বেত ভাঙবেন– বলল পায়েল।

স্যার দেখবেন না। আমরা পালিয়ে যাব।

স্যারের চোখ ফাঁকি দেওয়া সহজ না– বলল রাশেদ।

দেখ কেমন ফাঁকি দেই। জানালা দিয়ে স্কুলের পেছনে লাফ দিয়ে পড়ল রিফাত। এরপর বন্ধুদের ডাকল। একে একে রিফাতের পথে বেরিয়ে এল ওরা। হাঁটল সার্কিট হাউসের দিকে। পেছনে বন্ধুরা। একরাশ উত্তেজনা আর স্বপ্ন নিয়ে সার্কিট হাউসের সামনে এল রিফাত। গেটে আটকে দিল পুলিশ। রিফাত বলল, বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব। একটা ছবি তুলব।

পুলিশ শুনছে না তার কথা। বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয় যাবে না। বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিল। রিফাতের মন খারাপ হলো। বন্ধুরা হাতাশ। এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। স্কুল পালিয়ে এসেছে। বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পারবে না। এটা হতে পারে না। যাবে তারা বঙ্গবন্ধুর কাছে।

খানিক দাঁড়িয়ে বুদ্ধি করল রিফাত। ফিরে সে যাবে না। বঙ্গবন্ধুর কাছে যাবে। বন্ধুদের বলল, বুদ্ধি একটা বের করতে হবে। কী বুদ্ধি করা যায়।

একটু ভেবে আঙুল তুলে বলল, পেয়েছি বুদ্ধি। দেয়াল টপকে ভেতরে যাব।

তারপর। পুলিশ দেখবে না? বলল রাশেদ।

– না দেখবে না। চুপি চুপি দেয়ালের পাশে দিয়ে গেটের কাছে চলে যাবে। যখন কেউ থাকবে না, তখন টুপ করে ঢুকে পরব ভেতরে। চলে যাব বঙ্গবন্ধুর কক্ষে। তারপর কে ফেরায়।

দারুন আইডিয়া। বলল রাশেদ।

পায়েলের ভয় লাগছে। দেয়াল টপকে ভেতরে নামলে পুলিশ টের পাবে। ছুটে এসে ধরবে। তারপর পেটাবে।

– ধরা পড়ব না। আয়।

চুপি চুপি দেয়ালের পাশে গেল রিফাত। মাথা তুলে দেখল কেউ নেই। এই সময় দেয়াল টপকাল। পুলিশ টের পেল না। প্রথমে সার্কিট হাউসের ভেতরে নামল রিফাত। এরপর পায়েল আর রাশেদ। সার্কিট হাউসের ভেতরের গেটে কেউ নেই। ডানে বামে তাকাল না। অমনি ঢুকে পড়ল ভেতরে। কোন রুমে আছেন বঙ্গবন্ধু? জানে না। হাঁটছে বারান্দায়। উঁকি দিচ্ছে কোন রুম খোলা। ভয়ও আছে। কেউ দেখে ফেললে রক্ষা নাই। পাচ্ছে না বঙ্গবন্ধুর খোঁজ। দাঁড়িয়ে বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করল। এরই মধ্যে এক ভদ্র লোক এসে সামনে দাঁড়ালেন। জানতে চাইলেন, তোমরা এখানে কী চাও?

প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল রিফাত। কেঁপে উঠেছিল বুক। সামলে নিয়ে সাহস করে বলল, বঙ্গবন্ধুকে দেখতে চাই।

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই কক্ষের ভেতর থেকে ডাক এল, এই ওদের আসতে দে। কারা আসছে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে?

এই তো বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ। কাল তার ভাষণ শুনেছে। কে দেখে আনন্দ। মুখে ফুটল হাসি। বঙ্গবন্ধু তাদের ডাকছেন। এবার কে আটকাতে পারবে? বন্ধুদের নিয়ে রিফাত ঢুকে পড়ল সেই কক্ষে। দাঁড়াল বঙ্গবন্ধুর সামনে। কোলবালিশে হেলান দিয়ে পাইপ টানছিলেন বঙ্গবন্ধু। তার পাশে আরো কয়েকজন বসে আছেন। বঙ্গবন্ধু তাকালেন রিফাতের দিকে। দরাজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোরা? কী চাস?

– রিফাত বলল, বঙ্গবন্ধুকে দেখতে চাই।

– কে বঙ্গবন্ধু?

– আপনি।

– কে বলছে?

– আপনার ছবি আছে আমাদের ঘরে। দাদুর ছবির পাশে।

– কে তোর দাদু?

– মোকলেজ মাতুব্বর।

বঙ্গবন্ধু উঠে বসলেন। পাইপ রাখলেন। মোকলেজ তোর দাদু। মনটা খারাপ হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর। তিনি শুনেছেন রিফাতের দাদুকে পাকিস্তানি আর্মিরা মেরে ফেলেছে। পাওয়া যায়নি তার লাশ। রিফাতকে কাছে ডাকলেন বঙ্গবন্ধু। আদর করলেন। আবারও জানতে চাইলেন কী জন্য এসেছিস তোরা? গেটে কেউ আটকায়নি?

– হ্যাঁ, আটকিয়েছিল। দেয়াল টপকে আসছি। আপনাকে দেখার জন্য।

– এত কষ্ট করে এসেছিস। দেখ বঙ্গবন্ধুকে। মন ভরে দেখ। দেখা হলো? এবার বল আর কী চাস?

– ছবি তুলতে চাই। আপনার সাথে আমার দাদুর ছবি আছে। আমার সাথে নাই।

বঙ্গবন্ধু হাসলেন। ডাকলেন ক্যামেরাম্যান। ওদের সাথে আমার ছবি তুলে দে।

ক্যামেরাম্যান ছুটে এল। বঙ্গবন্ধুর সাথে ছবি উঠিয়ে দিল। বঙ্গবন্ধু বললেন, ছবি এখন নিতে পারবি না। ঢাকায় যেতে হবে ছবি আনতে। আমার বাড়িতে যাইস তোরা।

রিফাত বলল, চিনি না আপনার বাড়ি।

– চিনতে হবে না। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বলবি। চিনিয়ে দেবে মানুষ। এখন বল আর কী চাস?

– অটোগ্রাফ চাই।

– সেটা আবার কী জিনিস?

– পাশ থেকে একজন বলল, স্বাক্ষর।

– আমার স্বাক্ষর দিয়ে তোরা কী করবি?

– তা কোথায় স্বাক্ষর করব? কাগজপত্র এনেছিস?

সবাই চুপ। কাগজ খাতা কিছু আনেনি। লজ্জায় মুখ লুকাতে চাইল। বঙ্গবন্ধু কাছে ডাকলেন। এদিকে আয়। কলম বের করলেন। রিফাতের ডান হাতটা ধরে তার ওপর লিখে দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। যা, দিয়ে দিলাম অটোগ্রাফ। মাথায় হাত দিয়ে আবারো সবাইকে আদর করলেন। বললেন, এবার যা। মন দিয়ে লেখাপড়া কর। মানুষ হতে হবে। তোদের একদিন দেশ চালাতে হবে।

রিফাতের আনন্দ দেখে কে। হাসতে হাসতে বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে এল। এবার গেট থেকে বের হলো। পুলিশ অবাক। থামাল। কীভাবে ঢুকলি তোরা?

রিফাত হাতটা বের করে দেখাল। বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ। পুলিশ কিছু বলল না। বাইরে বের হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রিফতা। বন্ধুরা বলল, এখন দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চল। যাবি না?

– না। বঙ্গবন্ধু বের হবেন। তাঁকে আর একবার দেখে যাই। কবে দেখব।

– বঙ্গবন্ধু তার বাড়িতে যেতে বললেন। যাবি না?

– সে তো অনেক পরের কথা। এখন বঙ্গবন্ধু সামনে আছেন। আর একবার দেখে যাই। খানিক পরেই বঙ্গবন্ধু বের হলেন। ফিরে যাবেন ঢাকায়। সঙ্গে অনেক নেতাকর্মী। হাঁটছেন সার্কিট হাউসের করিডর দিয়ে। বঙ্গবন্ধুকে দেখে সবাই স্লোগান তুলল। স্লোগান শুনে রিফাত দৌড়ে দেয়ালের উপর উঠে গেল। শুরু করল স্লোগান। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বন্ধুরাও রিফাতের স্লোগান ধরল। রিফাত উচ্চস্বরে স্লোগান দিচ্ছে। ঘেমে ভিজে গেছে। কণ্ঠও ধরে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর চোখ এড়িয়ে গেল না এবারো। দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। সবাইকে থামিয়ে দিলেন। ডাকলেন রিফাতকে। নেমে আয়।

রিফাত এসে সামনে দাঁড়াল। বঙ্গবন্ধু মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন। তুই তো ঘেমে ভিজে গেছিস। এইবার থাম। অনেক স্লোগান দিয়েছিস। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পড়াশোনা ভালো করে করবে। পড়াশোনায় ভালো চাই। এরপর বঙ্গবন্ধু চলে এলেন ঢাকায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রিফাত ফিরে গেল বাড়িতে। সে আজ বঙ্গবন্ধুকে দেখেছে। অটোগ্রাফ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। ছবিও তুলেছেন। একদিন ঢাকায় যাবে। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। তখন ছবিটা নিয়ে আসবে।

স্কুলে ফিরে রিফাত সবাইকে জানাল বঙ্গবন্ধুর কাছে গেয়েছিল। বন্ধুরা অবাক। কী বলছিস! বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলি। বিশ্বাস করছে না বন্ধুরা। মুখে বললেই হলো নাকি। বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়া সহজ না। যেতে পারিস না হেডস্যারের রুমে।

মৃদু হেসে রিফাত বলল, তোদের বিশ্বাস হচ্ছে না?

– না, বিশ্বাস হচ্ছে না।

হাতটা তুলে ধরল বন্ধুদের সামনে। অবাক চোখে সবাই তাকাল। সত্যি রিফাত বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল। দেখতে চাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ। হাতখানা পেতে রাখল রিফাত। বন্ধুরা সবাই মাথা ঝুকে দেখছে। এক বন্ধু হাত বাড়াল। ধরে দেখবে। না না তা হবে না। হাত ধরা যাবে না। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পারিস। বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ। সাধারণ কথা নয়। মুছে যেতে পারে।

বন্ধুরা আফসোস করছে। আহা তারা যদি বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে পারত। বঙ্গবন্ধু ছোটোদের এত ভালোবাসেন। ওদের কাছে নিলেন। আদর করলেন। অটোগ্রাফ দিলেন। ভাবতেই পারছে না।

বঙ্গবন্ধুর দেওয়া অটোগ্রাফ নিয়ে মহাআনন্দে বাড়ি ফিরল রিফাত। বাড়ি মাথায় তুলল। হাতটা খুব সাবধানে রাখল। যেন অটোগ্রাফ মুছে না যায়। মা জানতে চাইলেন হাতে কী হয়েছে? এমন লুকিয়ে রাখছিস কেন?

দেখাল বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ। রিফাতের হাত দেখছেন না মা। দেখছেন হাতের চাঁদ। তুই বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলি রিফাত? দেখা পাইলি বঙ্গবন্ধুর?

এই যে অটোগ্রাফ। বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?

অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন মা। কথা নাই তার মুখে। রিফাত বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল। খানিক পরে বললেন, তা বঙ্গবন্ধু কী বললেন?

বললেন লেখাপড়া করিস। দেশ তোদেরই চালাতে হবে।

– তোর দাদুর কথা বলেছিলি?

– হ্যাঁ। শুনে মন খারাপ করলেন বঙ্গবন্ধু। আমি বললাম দাদুর সাথে আপনার ছবি আছে। তারপর আমার সাথে ছবি তুললেন বঙ্গবন্ধু। বললেন, ঢাকায় তার বাড়িতে যেতে।

– তাই। বঙ্গবন্ধুর সাথে এত কথা বলেছিস?

– হ্যাঁ, অনেক কথা হয়েছে।

হাত নিয়ে বসে আছে রিফাত। গোসল করে না। অটোগ্রাফ ধুয়ে যাবে। ভাত খায় না। ধুয়ে যাবে বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ। ভাত খাইয়ে দিলেন মা। রাতে গৃহশিক্ষক এলেন। তাকে বলল বঙ্গবন্ধুর কথা। দেখাল অটোগ্রাফ। রিফাতের এত আনন্দের অটোগ্রাফটা পরদিন ধুয়ে গেল। গোসল করতে গিয়ে হাত তুলে রেখেছিল মাথার ওপর। কীভাবে জানি পানি ওখানে পৌঁছে গেল। খানিক পরে দেখল অটোগ্রাফ নাই। খুব মন খারাপ হলো তখন। চোখে পানি এসে গেল। বারবার দেখছে হাতটা। এই হাতে বঙ্গবন্ধু অটোগ্রাফ দিয়েছেন। রাখতে পারল না সেটা। আবার বঙ্গবন্ধুর কাছে যাবে সে। এবার ডায়েরি নিয়ে যাবে। সেখানে অটোগ্রাফ নিবে। সংরক্ষণ করে রাখবে। সবাইকে দেখাবে এটা বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ।

অটোগ্রাফ মুছে যাওয়ায় রিফাতের খুব মন খারাপ হলো। তখন বাবা নিয়ে এলেন মন ভালো করা খবর। পত্রিকায় রিফাতের ছবি ছাপা হয়েছে। যে ছবিতে রিফাতের মাথায় হাত দিয়ে বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন। রিফাত হাসল মুখ ভরে। আনন্দ দেখে কে। মুহূর্তের মধ্যে সব দুঃখ ভুলে গেল সে। বাবার কাছে জানতে চাইল পত্রিকা কোথায়? নিয়ে আসনি বাবা।

বাবার তখন মন খারাপ হলো। পত্রিকা পাননি। অনেক চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকা গিয়ে পরে সংগ্রহ করবেন। তখন রিফাত চুপ হয়ে গেল। হারিয়ে গেল সব আনন্দ। বঙ্গবন্ধুর সাথে পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়েছে। সে দেখতে পারল না। খানিক পরে বাবাকে বলল, থাক। পত্রিকা দরকার হবে না। বঙ্গবন্ধু যেতে বলেছেন তাঁর বাড়িতে। তখন ছবি দিবেন। আমি বলছিলাম আপনার সাথে দাদুর ছবি আছে। আমারও একটা থাকা চাই। বঙ্গবন্ধু হেসে বললেন, আমার বাড়িতে আসিস। তোকেও ছবি দেব। ওই ধানমন্ডি ৩২ নম্বর। ওখানেই নাকি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি।

বাবা বললেন ঠিক আছে, একদিন নিয়ে যাব।

তারপর তো অনেক দিন হয়ে গেল। তবু রিফাতের মন থেকে দূর হয়নি বঙ্গবন্ধু। চোখের সামনে ভাসে। মাঝে মাঝেই হাতের দিকে তাকায়। মনে হয় এখনো লেখাটা সে দেখতে পাচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান। কেমন করে বঙ্গবন্ধু কথা বলছেন। তার সাথে ছবি তুলছেন। বন্ধুদের সাথেও সে গল্প দিচ্ছে দিনের পর দিন। ঢাকা যাবে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে– তাও বলছে। রিফাত এখন বন্ধুদের কাছে হিরো। কিন্তু এক সকালে রিফাতের সব স্বপ্ন মাটি হয়ে গেল। বাজার থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়িতে এলেন বাবা। ধপাস করে বসে পড়লেন। একটা কথাও বললেন না। বাবার বড্ড মন খারাপ। চোখে জলের ছোঁয়া। কী হলো হঠাৎ। বাড়ির সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। রিফাত এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল না কী হয়েছে? তোমার মন খারাপ কেন? দেখল বাবা ভেঙে পড়ছে। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। কিছুটা স্বাভাবিক হোক তারপর শুনতে পারবে কী হয়েছে। অনেকক্ষণ লাগল বাবার ভেতর প্রাণ ফিরতে। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বললেন সেই খবর। যে খবর শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল রিফাতের মাথায়। শব্দ করে কান্না শুরু করল। বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলতে পারে মানুষ? এটা রিফাত বিশ্বাস করতে পারছে না। যে একটা দেশ এনে দিল, মানুষকে এত ভালোবাসে, তাঁকে মানুষ মারবে কেন? কিছুটা শান্ত হয়ে বাবার কাছে এল। সত্যি বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে বাবা?

চোখের জল আড়াল করে বাবা বললেন, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। সবাইকে মেরে ফেলেছে।

নতুন করে কান্না পেল রিফাতের। বারবার মনে ভেসে উঠল বঙ্গবন্ধুর মুখ। সেই চিত্র দেখছে। তার হাতটা ধরে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। মাথা হাত দিয়ে ছবি তুলছেন। বলছেন পড়াশোনা ভালো করে করিস। তোরাই দেশটা চালাবি। এরপর গিয়ে দাঁড়াল সেই ছবিটার সামনে। একই ফ্রেমে বাধানো তার দুই দাদু। দুই প্রিয় মানুষ। দুজনকেই মেরে ফেলেছে। একজনকে পাকিস্তানিরা। অন্যজনকে বাঙালি। বাঙালির ওপর রিফাতের মনে প্রচণ্ড ঘৃণা জমল। ওরা না হয় আমাদের শত্রু ছিল। বাঙালি কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে মারতে পারল? এই প্রশ্নের উত্তর সে কারো কাছে পায়নি।

সেদিনের পর রিফাত আর হাসে না। কথাও তেমন বলে না। বঙ্গবন্ধুর কথা উঠলে সেখানে দাঁড়ায় না। বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলেই তার চোখে জল আসে। মাঝে মাঝে স্কুল থেকে ফিরে ছবিটার সামনে দাঁড়ায়। নিমগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কী দেখে এই ছবিতে কেউ জানে না। বাবা মা দেখেন। কিছু বলেন না। জানেন রিফাতের মনে অনেক কষ্ট।

তারপরও অনেক দিন কেটে গেছে। রিফাত ভাবল একদিন ঢাকায় যাবে। বঙ্গবন্ধু তাকে যেতে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কথা রাখবে সে। বঙ্গবন্ধুর দেখা পাবে না। বাড়িটা দেখে আসবে। ছবিটা হয়তো পাবে না। বঙ্গবন্ধু তাকে আদর করবেন না। বলবেন না ছবি নিতে এসেছিস? তো এতদিন পরে ওটা দিয়ে কী করবি? আয় নতুন ছবি তুলি। এসব ভেবে বন্ধুদের নিয়ে রিফাত একদিন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এল। সামনে দাঁড়িয়ে দেখল বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। এরপর ঢুকল ভেতরে। ভাবল আজ যদি বঙ্গবন্ধু থাকতেন। কেমন হতো। তাদের পেয়ে আনন্দে হারিয়ে যেতেন। বলতেন তোরা এসেছিস? আজও মনে আছে তোদের সে কথা।

রিফাত ঘুরে ঘুরে দেখছে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। এক কক্ষ রেখে আর এক কক্ষে যাচ্ছে। সিঁড়িতে উঁকি দিচ্ছে। দেখছে কোথায় পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর লাশ। একটা কক্ষে ঢুকে রিফাতের চোখ আটকে গেল। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল দেয়ালে চোখ ঝুলিয়ে। দেখল সেই ছবিটা। বঙ্গবন্ধু তার মাথা হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ছবি দেখে চোখের পানি আটকাতে পারল না রিফাত। জল গড়িয়ে যাচ্ছে তার দু চোখের কোণ দিয়ে। বন্ধুরা অবাক। কী হলো তোর? কেন কাঁদছিস?

রিফাত কিছু বলতে পারছে না। তার মুখে কথা নাই। আঙুল তুলে বন্ধুদের দেখাল সেই ছবি। অবাক চোখে বন্ধুরা তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। চোখ কেউ সরাতে পারছে না। দেখছে রিফাতের মাথায় বঙ্গবন্ধুর হাত।

ওয়েবসাইটে 'মুজিব শতবর্ষ' নামক সেবা বক্স সংযোজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে 'মুজিব শতবর্ষ' নামে একটি সেবা বক্স সংযোজন করা হয়েছে। এই সেবা বক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ আলোকচিত্র, মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ক তথ্যবিবরণী, আলোকচিত্র ও ফিচার সংরক্ষিত রয়েছে। সেবাগ্রহীতারা সহজেই তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট www.press-inform.gov.bd-এর 'মুজিব শতবর্ষ' নামের সেবা বক্স থেকে উল্লিখিত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: নাওফেল রহমান

করোনা ভাইরাস: আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সচেতনতা

আহনাফ হোসেন

বিশ্বজুড়ে নতুন এক আতঙ্কের নাম 'করোনা ভাইরাস'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নতুন এ ভাইরাসের নাম দিয়েছে– '২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস'। এটি এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস যা এর আগে কখনো মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি। করোনা ভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে। এর মধ্যে মাত্র ছয়টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। তবে নতুন ধরনের ভাইরাসের কারণে সেই সংখ্যা এখন সাতটি। ২০০২ সালে চীনে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া সার্স (সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) নামে যে ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল আর ৮০৯৮ জন সংক্রমিত হয়েছিল, সেটিও ছিল এক ধরনের করোনা ভাইরাস।

মধ্য চীনের উহান শহর থেকে ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাসের সূচনা। গত ৩১শে ডিসেম্বর উহান শহরে নিউমোনিয়ার মতো একটি রোগ ছড়াতে দেখা যায়। চীনা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সতর্ক করে। এরপর ১১ই জানুয়ারি প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠিক কীভাবে শুরু হয়েছিল তা এখনো বিশেষজ্ঞরা নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। তবে তারা বলেছেন, সাধারণত এসব ভাইরাস মানব শরীরে বাসা বাঁধে কোনো একটি প্রাণী থেকে এসে। নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ জোনাথন জানিয়েছেন, আমরা যদি অতীত মহামারিগুলোর দিকে তাকাই, এমনকি এটা যদি করোনা ভাইরাস হয়, এটা কোনো না কোনো একটি প্রাণীর শরীর থেকে এসেছে। সার্স ভাইরাস প্রথমে বাদুরের শরীর থেকে খট্টাশের শরীরে এবং পরে সেটা মানব শরীরে চলে আসে। মধ্যপ্রাচ্যের ফুসফুসের রোগ মার্স (মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম), যাতে ২৪৯৪ জন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৮৫৮ জন মারা গিয়েছিল, সেটি এক কুঁজওয়ালা উট থেকে মানব শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। করোনা ভাইরাসের সাথে উহান শহরের সামুদ্রিক খাবারের একটি বাজারে গিয়েছিল এমন লোকদের সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। ওই বাজারটিতে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী বেচাকেনা হতো। এছাড়া কিছু সামুদ্রিক প্রাণী যেমন বেলুগা জাতীয় তিমি করোনা ভাইরাস বহন করতে পারে। উহানের ওই বাজারে জ্যান্ত মুরগি, বাদুড়, খরগোশ এবং সাপ বিক্রি হতো। ভাইরাসটি এখন চীনের অন্যান্য শহর এবং থাইল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বেশ কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইতোমধ্যে ২ সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হলে তার দেহে লক্ষণ দেখা দিতে প্রায় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি জানতে পারে না যে, তার দেহে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে কি-না। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তার সংস্পর্শে আসা অন্য লোকেরা সংক্রমিত হতে পারে। তাই সার্স কিংবা ইবোলার চেয়ে নোভেল করোনা ভাইরাসটি অনেক বেশি বিপজ্জনক। জ্বর দিয়ে শুরু হয় এই ভাইরাসের সংক্রমণ, এরপরে দেখা দেয় শুকনো কাশি এবং পরবর্তীতে শ্বাসকষ্ট। অসুখ আরো বাড়লে কিডনি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনো ঔষধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি। নিজেকে সাবধানে রাখাই এ রোগের শ্রেষ্ঠ উপায়। চিকিৎসকরা এ ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন:

- ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন বা এ ভাইরাস বহন করেছেন– এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
- যতটা সম্ভব ঘরেই থাকার চেষ্টা করুন। বাইরে প্রয়োজন ছাড়া বের হবেন না।
- বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাইরে থেকে ফিরে হ্যান্ডওয়াশ বা লিকুইড সোপ দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিন।
- বাইরে যাওয়ার আগে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে যান। সকালে ঘণ্টাখানেকের জন্য জানালা খোলা রাখুন। তাতে পর্যাপ্ত সতেজ বাতাস এবং সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করবে।
- প্রচুর ফলমূল এবং পর্যাপ্ত পানি পান করুন। কোনো কিছু খাওয়া কিংবা রান্না করার আগে ভালো করে ধুয়ে নিন।
- ডিম কিংবা মাছ-মাংস অবশ্যই ভালো করে সিদ্ধ করে খাবেন।

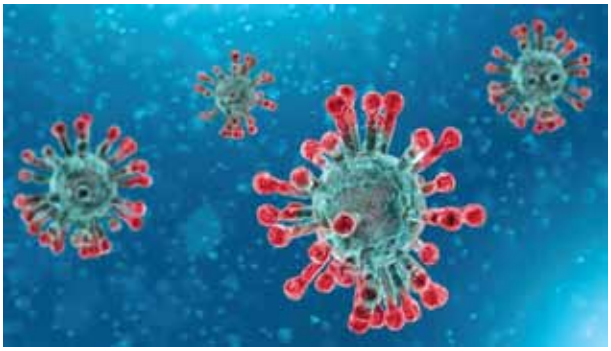

- হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখুন।
- অসুস্থ পশু/পাখির সংস্পর্শে আসবেন না।
- ময়লা কাপড় এবং ঘর পরিষ্কার রাখুন।
- অসুস্থবোধ করলে অথবা আপনার পরিচিত কেউ আক্রান্ত মনে হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

করোনা ভাইরাস যেন আরো ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্য চীন উহান অঞ্চলটি একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। আরো প্রায় এক ডজন শহরের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে পড়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ। অনেক এলাকায় বড়ো জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অনেক পর্যটন এলাকা, যার মধ্যে চীনের গ্রেট ওয়াল রয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত চীন ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকা এবং অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। করোনা ভাইরাস যেসব দেশে দেখা দিয়েছে সেসব দেশে ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার ১৪ দিনের মধ্যে জ্বর (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট/৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর বেশি), গলাব্যথা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে অতিসত্ত্বর সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। চীনা নাগরিকদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা সাময়িক স্থগিত করেছে বাংলাদেশ সরকার। দেশের স্থল ও নৌ বন্দরে স্ক্যানিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেওয়া হয়েছে সতর্কতামূলক আরো অনেক ব্যবস্থা। উহান থেকে আগত সকলকে ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রকল্পে কর্মরত চীনা শ্রমিকদের মধ্যে যারা উহানে গেছেন তাদের এ মুহূর্তে আর আসতে দেওয়া হবে না। নবায়ন করা হবে না তাদের ওয়ার্ক পারমিটও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ডাবল চেকআপ করা হচ্ছে চীন ছাড়াও অন্যান্য দেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের। ১৮ই জানুয়ারির পর চীন থেকে এসেছেন তাদের সবাইকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হয়নি, তাই অহেতুক আতঙ্কিত না হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পক্ষ থেকে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

সচেতনতায় শিশু ক্যানসার ভালো হয়

জুয়েল মোমিন

শিশুর আগমন ধ্বনি কান্নার হলেও তা আমাদেরকে আনন্দে ভাসায়। মনের মধ্যে সুখের সঞ্চার করে। আজকে যারা শিশু তারাই আগামী দিনের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। কিন্তু মরণব্যাধি ক্যানসারের আক্রমণে অকালে সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় অনেক শিশু। প্রতিবছর ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়ছেই। ওয়ার্ল্ড চাইল্ড ক্যানসারের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর ২ লাখ শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। আর এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশগুলোতেই আক্রান্ত হয় শতকরা ৮০ ভাগ। এখানে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের বেঁচে থাকার হার মাত্র ৫ ভাগ। অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলোয় এই হার ৮০ ভাগ।

সংস্থাটির তথ্য মতে, বর্তমানে ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রায় ১৩ থেকে ১৫ লাখ ক্যানসারে আক্রান্ত শিশু রয়েছে। ২০০৫ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আর সচেতন না হলে ২০৩০ সালে এ হার দাঁড়াবে ১৩ শতাংশে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ না থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেনেটিক্যাল কারণ, ভাইরাস, খাবারে টক্সিনের উপস্থিতি, ক্যামিকেল, পরিবেশগত সমস্যায় শিশুদের ক্যানসার হয়। সচেতনতা, সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের জীবন বাঁচানো সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যানসার নিরাময় সম্ভব।

শিশুদের মূলত জিনগত ত্রুটি ও বিভিন্ন কারণে ক্যানসার হয়ে থাকে। যদিও শিশুদের ক্যানসার বেশির ভাগই জন্মগত। নিও-রোব্লাস্টোমা, নেফ্রোব্লাস্টোমা, রেটিনোব্লাস্টোমা ইত্যাদি ক্যানসার নবজাতক শিশু বা একেবারে ছোটো শিশুদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। লিউকোমিয়া, হজকিন্স, নন হজকিন্স, নিম্ফোমা, বোন টিউমার, বোন ম্যারো ক্যানসার ইত্যাদি ছোটো-বড়ো সব বয়সের শিশুদের হতে পারে। শিশুদের ক্যানসারের কিছু লক্ষণ রয়েছে। এ উপসর্গগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়। কারণ প্রথমেই ধরা পড়লে শিশুটির জীবন রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে শিশুদের ক্যানসারের লক্ষণগুলো দেওয়া হলো–

১. নাক থেকে ঘন ঘন রক্তপাত
২. ক্ষত না সারা
৩. গ্রন্থি (লিম্ফ নোড) ফুলে ওঠা
৪. ওজন কমে যাওয়া
৫. লঘু শ্বাস-প্রশ্বাস
৬. ব্যাখ্যাতীত জ্বর
৭. শরীরে চাকার মতো অনুভব করা
৮. দুর্বলতা
৯. স্বভাবে অভাবনীয় পরিবর্তন
১০. মাথাব্যথা
১১. বমি করা
১২. চোখে দেখতে অসুবিধা
১৩. ফিট বা অচেতন হওয়া
১৪. হাড়ে বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা
১৫. মলমূত্র ও বমির সঙ্গে রক্তপাত ইত্যাদি। উল্লেখিত এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা করাতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে ক্যানসার নিরাময় করা সহজ হয়। অসচেতনতা ও অপচিকিৎসা ক্যানসারে শিশুর মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। শিশু দুর্বলতা বোধ করলে অনেক সময় অভিভাবকরা মনে করেন সে স্কুল ফাঁকি দিতে চাচ্ছে কিংবা সে অলস। কিন্তু তা নাও হতে পারে। বরং এসব লক্ষণগুলোর একটাও দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। শিশুদের সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার যেমন: পালং শাক, ব্রোকলি, ডিমের কুসুম, মটরশুটি, কলিজা, মুরগির মাংস, কচুশাক, কলা, মিষ্টি আলু, কমলা, শালগম, দুধ, বাঁধাকপি, বরবটি, কাঠ বাদামের মতো ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুদের ক্যানসার মোকাবিলায় সবার আগে সমাজের প্রত্যেক স্তরে বাড়াতে হবে সচেতনতা এবং এই জন্য প্রতিবছর এই বিষয়ে সর্বমহলে জানান দেওয়ার জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস' পালন করা হয়। শিশু ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০২ সালে চাইল্ড ক্যানসার ইন্টারন্যাশনাল (সিসিআই) কর্তৃক এ দিবসটি পালন শুরু হয়। সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও এ দিবসটির অন্যতম লক্ষ্য হলো শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করা এবং ক্যানসার সম্পর্কিত ব্যথা ও এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা শিশুদের দুর্দশা হ্রাস করা। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিসিআই অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রতিবছর তিন লাখেরও বেশি শিশুর জন্মের ১৯ বছরের মধ্যে ক্যানসার ধরা পড়ে এবং প্রতি ৩ মিনিটে একটি শিশু ক্যানসারে মারা যায়। ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে বেশিরভাগই লিউকোমিয়া। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, অধিকাংশ শিশু ক্যানসার চিকিৎসাযোগ্য। প্রাপ্তবয়স্ক ক্যানসারের তুলনায় শিশু ক্যানসারের ক্ষেত্রে আরো সফলভাবে চিকিৎসা করা যায়।

অসংক্রামক এ রোগের প্রকোপ বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। ভেজাল খাদ্য গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, সচেতনতার অভাব, সঠিক তথ্য না জানা ইত্যাদির কারণে এ অসংক্রামক রোগটি বেড়েই চলেছে এবং ফুটফুটে সুন্দর শিশুদের জীবনাবসান হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে। আশার বাণী হলো, সরকার ইতোমধ্যে দেশের সব বিভাগে ১০০ শয্যার ক্যানসার হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার সহজলভ্যতা বিভাগ পর্যন্ত নিশ্চিত করতে পারলে সারা দেশের লাখ লাখ মানুষ কম খরচে এই সেবা পেতে পারবে। তাদেরকে আর রাজধানীমুখী হতে হবে না বলে মনে করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহেদ মালেক। এককালীন আর্থিক অনুদান ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রদান করছে সরকার। বাংলাদেশে এখন ক্যানসারের চিকিৎসা পর্যাপ্ত রয়েছে। তাই শিশুদের ক্যানসার হলে পরিবারকে ভেঙে না পড়ে দ্রুত তাদের চিকিৎসা করাতে হবে সঠিক উপায়ে। তাহলেই তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শীতার্ত নারী-শিশুসহ আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াই

ফারিহা হোসেন

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই ঋতুর পালাবদল ঘটে। মনুষ্য সৃষ্ট নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতায় সেই প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে চলতে পারছে না। আর তাই প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিচ্ছে মানুষের ওপর। এ কারণে ছয় ঋতুর বাংলাদেশে ছয় ঋতুর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। হাজার বছর ধরে প্রকৃতি মানুষকে নানাভাবে সহায়তা করছে জীবন ধারণে ও বাঁচতে। কিন্তু এখন প্রকৃতির বৈরিতা পুরো বিশ্বে নির্মম প্রভাব ফেলছে। প্রকৃতির বিরূপ প্রভাবে ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, বাড়ছে ক্ষতির পরিমাণও। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে 'পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত আমাজান জ্বলছে, জ্বলছে অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ এলাকা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পাকিস্তান, সিন্ধু, জম্মুকাশ্মীরসহ যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু প্রদেশে বরফ পড়ছে ব্যাপক হারে। এতে মানুষ মরছে, বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে প্রচণ্ড শীতে বেশি কাবু হচ্ছে শিশু, নারী, বয়স্করা। সরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শীতার্তদের পাশে বিত্তবান, ধনী শ্রেণির মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। শীত এলে শীতের নানা সবজিতে ভরে যায় বাজার। শীতের মাঝামাঝি শৈত্য প্রবাহের সঙ্গে তীব্র ঘন কুয়াশা যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। বিশেষ করে নৌপথে যোগাযোগ ও যাতায়াতে থাকে বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা। কৃষির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই।

যাদের কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য জোগাড় করাই মূল বেঁচে থাকা, সেখানে শীত থেকে বাঁচার কোনো বস্ত্র তাদের নেই। তাই বাংলাদেশের সেই সব দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষগুলো শীতে শারীরিক কষ্ট পায়– যা আমরা দেখি পথে চলতে, টিভির পর্দায় কিংবা পত্রিকায়। বাংলাদেশের এসব নিঃস্ব মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্ট আমাদের শুধু কাঁদাবে না বরং জাগাবে, চেতনার দুয়ার খুলে দিবে, খুলে দিবে মানবতার সকল বন্ধ দরজা। আমরা অনেকেই হয়তো গেল বছরের শীতকালের পোশাকটা থাকা সত্ত্বেও আরেকটা কেনার ইচ্ছে করছি। সে যাই হোক পুরনোটা দিয়ে আমরা পারি অসহায়-দরিদ্র আর ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষকে হাড় কাঁপানো শীত থেকে কিছুটা বাঁচাতে।

শীতে নানা ধরনের রোগ যেমন: সর্দি-কাশি, জ্বর, হাঁপানি, পেটেরপীড়াসহ নানা জটিল রোগ দেখা দেয়। দৈনন্দিন কর্মপরিবেশে ছন্দপতনের কারণে খেটে খাওয়া মানুষের কাজের সুযোগ ও সক্ষমতা কমে আসে। তাই সামর্থ্যবানদের কর্তব্য হলো মানবসেবার ব্রতে এগিয়ে আসা এবং শীতার্তদের পাশে দাঁড়ানো। দেশের সরকার, বিত্তবান মানুষ, নানা সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শীতের কষ্ট থেকে অসহায় মানুষকে বাঁচানো যেতে পারে। মৌসুমের প্রথম শৈত্যপ্রবাহ অবশ্য নগরবাসী, বিশেষ করে রাজধানীবাসীর কাছে তেমন তীব্রতায় অনুভূত হচ্ছে না। তবে গ্রামে অনুভূত হচ্ছে প্রচণ্ড শীত। কুয়াশা ও ঠাণ্ডা বাতাস বাড়িয়ে দিয়েছে শীতের তীব্রতা। দেশের সবকটি জেলাতেই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য হ্রাস পেয়েছে, যা তীব্র শীতের অন্যতম কারণ। শীতের কারণে হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

নগরজীবনে মানুষ যখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, সে সময়ে শীতের ছোবলে বিপর্যস্ত মানুষের নীরব ক্রন্দন তাদের কানে পৌঁছবে এমন ভরসা কম। সে কারণে সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজকর্মীদের উদ্যোগী হয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজটি নিজ কাঁধে তুলে নিতে হবে। দক্ষিণাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ তীব্র শীতের প্রকোপে কাবু হয়ে পড়ে। পত্রপত্রিকায় উঠে আসা সংবাদে আমরা এ-ও জানি, শীতজনিত রোগে মারা যায় অনেক শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ।

মানুষ মানুষের জন্য। এই নীতিবাক্যকে সত্য জেনে অন্তত সরকারের বাইরে কোনো কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সীমিত পর্যায়ে হলেও দরিদ্রদের জন্য শীতবস্ত্র সংগ্রহের কর্মসূচি চালাচ্ছেন। কিন্তু তা তুলনায় কম। একটি কম্বল একজন শীতার্ত মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে– এটি সচ্ছল প্রতিটি মানুষেরই স্মরণে রাখা চাই। শীতে জনজীবন সাময়িকভাবে স্থবির হয়ে পড়ে বটে, তবে কারও জীবন শীতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাক, এমনটা প্রত্যাশিত হতে পারে না। তাদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য আন্তরিকভাবেই সক্রিয় হতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শীতের কষ্ট থেকে অসহায় মানুষকে বাঁচানো যেতে পারে।

সৃষ্টির সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রতিটি মহৎ কাজে সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এলেই পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে বাধ্য। কারণ, আমার দেওয়া একটি গরম কাপড় কারো জন্য একরাশ উষ্ণতা। আমার একটু সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারো জন্য বেঁচে থাকার অবলম্বন। বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন ও বিত্তবান মানুষকে দেখা যায় সাধারণ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করতে। এটি অবশ্য ভালো উদ্যোগ। এ ধরনের কর্মকাণ্ড আরো ব্যাপক পরিসরে হওয়া চাই। আমি, আপনি সর্বোপরি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলোই হবে বৃহত্তর শক্তির ফসল। আর এখানেই বিদ্যমান একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্বিক উপাদান নিহিত। তাই আসুন, আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছিন্নমূল শীতার্ত এবং নানান শ্রেণির সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সাহায্যার্থে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানবতার হাত সম্প্রসারিত করি।

লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, পরিবেশ এবং প্রযুক্তির অন্বেষণে যুক্ত

আমার অস্তিত্বের কলতান

ওয়াসীম হক

শেকড়ে প্রোথিত মাতৃভাষার আশ্রয়ে
অস্তিত্বের নিবিড় ছোঁয়া, প্রতিটি শিশির ধোয়া প্রাতে
অনুভব করি বর্ণমালার কলতান।
বেঁচে থাকার নিশ্বাসে,
ভাষা শহিদের আত্মত্যাগের অনুরণন।
এই চেনা পথ, সবুজের ঘন ছায়া
নদীর কলতান, সবটুকু জুড়েই সালাম, রফিক
আর বরকতের রক্তাক্ত স্লোগান।
আজ ও আগামীর সেতুবন্ধনে
সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হবো,
বিশ্বময় ছড়িয়ে দেব কৃষ্ণচূড়ার রঙে,
বাংলা ভাষার জয়গান।

একুশ আমার

মুসলিমা খাতুন (শান্তি)

একুশ আমার মায়ের ভাষা।
একুশ আমার বাঁচার আশা।
একুশ আমায় বর্ণ শেখায়।
একুশ আমায় স্বপ্ন দেখায়।
একুশ বাহান্ন-এর তাজা রক্তের নাম।
একুশে প্রাণ দিল রফিক, শফিক, বরকত, সালাম।
একুশ বাংলার শহিদমিনার।
একুশ বাংলার আপামর জনতার।
একুশ বাংলার প্রভাতফেরি।
একুশ নিয়ে তাই গর্ব করি।
একুশ-এর রং কৃষ্ণচূড়ায়।
একুশ দোলে লাল-সবুজ পতাকায়।
একুশ-এর সুর সারা বিশ্বজুড়ে।
একুশ শুধু বাংলার, বাংলাই মেলে।

একুশের ফুল

ছাদির হুসাইন ছাদি

একুশ তুমি বাঙালির মুখে
থাকবে চিরকাল,
একুশ তুমি গর্জে ওঠা
সবুজের বুকে লাল।
একুশ তুমি ফেব্রুয়ারির
অমূল্য এক ধন,
একুশ তুমি বীর বাঙালির
বাংলা ভাষার পণ।
একুশ তুমি শহিদমিনারে
রাঙা ফুলের সাজ,
একুশ তুমি খুন রাঙানো
স্বাধীনতার তাজ।
একুশ তুমি বাংলাদেশের
অহংকারী ফুল,
একুশ তুমি মা জননীর
ভালোবাসার কোল।
একুশ তুমি বাংলার বুকে
লাল সূর্যের আলো,
একুশ তুমি সুখের প্রদীপ
সবার মাঝে জ্বালো।

একুশ

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

ভাষা শহিদের তরতাজা রক্তে রঞ্জিত বাংলার
রক্তস্নাত ডালে ডালে ফুল
একুশ ধারণ করে আছে আমার
কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল।
মহান একুশ করছে লালন
বাংলার সব পাখি
শহিদের ভাষায় মুখর প্রতিটি বন-উপবন
কিচিরমিচির ডাকিডাকি।
কিন্তু সৃষ্টিসেরা
এই মানুষেরা
এখন আর ধারণ করে না শহিদের কোনো স্মৃতি;
ধীরে ধীরে হচ্ছে নিঃশেষ বাংলা ভাষা প্রীতি।

পরিযায়ী

সাদিয়া সিমরান

একটা পাখি কষ্টে দোলে গোলাপবাগে
নষ্ট আঁচল বিছিয়ে দিয়ে হরেক রঙের পাখনা মেলে
গঙ্গা স্নানে স্নিগ্ধ হয়ে
শেষ পরানের গান গেয়ে সে
উড়ল। ঘোরলো শেষে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
তোমার ডাঙায় আছড়ে পরে
পরিযায়ী ফিরবে শেষে নিজের ভূমে।

নীলাচল

রাবেয়া নূর

মেঘালয় ঐ নীলাচলে উঠতে তুমি
হাত বাড়ালে, আমি কপট রাগে
মুখ ফেরাতে বললে তুমি
'অনেক দূর এলাম চলে
ফিরব না আর একা ঘরে।
জনম গেল; রংধনুর ঐ সাত রঙটি পারিনি ছুতে
বিবর্ণ আকাশ তোমাকে দিলাম
বললে তুমি, শত জনমে
এমন পাওয়া আর কে পায়!

মা

ফাহ্‌মিদাতুন্নেছা

মা আমার প্রথম ভাষা।
মা আমার ভালোবাসা।
মা আমার আলোর দিশা।
মা থেকে কথা শেখা।
মা থেকে সত্য শেখা।
মা থেকে বিদ্যা শেখা।
মা থেকে ভালোবাসতে শেখা।
মা থেকে শ্রদ্ধা করতে শেখা।
মা থেকে দান করতে শেখা।
জগতের সব ভালো মা থেকে শেখা।

কে তুমি একাকী

দেলোয়ার হোসেন

পাহাড়ের নিচে ঝরনা ঝরার গান
সবুজ গুল্মলতা, কাঁপে থরো থরো,
কে তুমি একাকী এই নির্জনে
ঝরনার শীতল জলে মাটির কলসি ভরো।
খুব চেনা চেনা ঐ মুখ ভাসে
হৃদয় গভীরে– স্বপ্নরা বাসর সাজায়
ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় লেখা
ও মেয়ের নাম জানি সে বনবিথী রায়।
একদিন দেখেছিলাম তার রাঙা
ঠোঁটের নিচে কী স্বপ্নীল কালো একটি তিল,
হাত বাড়াতেই কেঁপেছিল শরীর
পাহাড়ের নিচে ঝরনার স্রোতে আলো ঝিলমিল।

হৃদয়ে প্রেম

মাইন উদ্দিন আহমেদ

ছেলেটার মধ্যে ছিল চমৎকার এক হৃদয়,
বয়স বাড়ার সাথে সাথে হলো প্রেম উদয়।
যখন সে দেখেছিল মিষ্টি একটি মেয়ে,
বায়ুতাড়া কেশরাশি আসছিল ধেয়ে।
ছেলেটার নাকে এল প্রেমেরই সুবাস,
হঠাৎ সে হয়ে গেল ভীষণ উদাস।
সবাই করল খেয়াল কিছু একটা হয়েছে,
কিন্তু সন্দেহ হলো সে কি কিছু বুঝেছে!
ঘনিষ্ঠজন সুধায় তারে কি হয়েছে তোর,
প্রচ্ছন্ন করেছে তোকে এ কিসের ঘোর!
যুবক দেখায় তারে সুন্দরি এক মেয়ে,
কখনোই যার সাথে হবে না তার বিয়ে।

কুয়াশা কাতর মন

রফিক হাসান

শীতের কুয়াশা ঝরে মাঠে মাঠে নদীর কিনারে
আলপথে হেঁটে যেতে যেতে পায়ে জড়ায় শিশির
সূর্যও লুকায় মুখ দেখা নেই সারাদিন বিল
হাওড়ের বুক ঢেকে যায় সাদা ধোয়ার আঁধারে
এইসব দিনে নদী মরে যায় শুয়ে থাকে, সাপ
খোলস ছাড়ে গর্তের আঙিনায় ঘুমায় নীরবে
বৃক্ষরা ঝরায় পাতা শরীরে লাগে ঠান্ডা কাঁপন
ফুটপাত বিছানায় গড়াগড়ি অভাবী মানুষ
ভোর রাতে শিশু কান্না ভাসে কাঁচাঘর ঝুপড়িতে
একটু ওমের খোঁজে কাটে কত অপেক্ষা প্রহর
মনের দরজা দিয়ে কখন ঢোকে শীত হাওয়া
হৃদয় কেমন হয় কুয়াশা কাতর কারা যায়
সুদূরে অজানা আলোর সন্ধানে জাগে সাধ ভরে
দেই চরাচর ঢেলে বুকের সবটুকু উষ্ণতা।

বাংলা ভাষা

সাজিদ হোসেন

আমার মায়ের মুখের ভাষা
গ্রামবাংলার মানুষের ভাষা
কৃষকের ফসল তোলার ভাষা
মাঝির নৌকা বাওয়ার ভাষা
শ্রমিকের কঠিন শ্রমের ভাষা
শিশুর আধো আধো মুখের ভাষা
বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে ৭ই মার্চের ভাষা
ষোলো কোটি বাঙালির ভাষা।

দেশকে ভালোবেসে

তাহমিনা বেগম

টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলেন মহৎ এক প্রাণ
ছোট্ট থেকেই চিনতো লোকে খোকা যে তাঁর নাম।
স্কুল থেকেই শুরু হলো তাঁর আদর্শ কর্ম
রক্তের মধ্যেই বইছিল যাঁর নেতৃত্বের ধর্ম।
স্বপ্ন সময়েই সব বাঙালির মন জয় করে নিলেন
শোষক আর শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন।
তাঁর আদর্শের ডাকে বাঙালিরা হলো ঐক্য
জান্তারা পারল না তাঁর কর্মকে করতে সহ্য।
রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল জান্তারা ঘুমন্ত
বাঙালির ওপর
হঠাৎ আক্রমণে বাঙালি স্তব্ধ
দেশকে ভালোবেসে শোষকদের বিরুদ্ধে জনতা
নেতার ডাকে হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য।
সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণপণে লড়ল
পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে দেশকে মুক্ত করল।
বিশ্ব দরবারে যুক্ত হলো নতুন একটি দেশ
লাল-সবুজের পতাকায় বাংলা নামে বেশ।
মহান নেতা মুজিবুর হলেন জাতির পিতা
যাঁর অবদান না থাকলে পেতাম না স্বাধীনতা।

শুন্য পাতার বুকে

শাহ্ সোহাগ ফকির

অশ্রু আর রুমালের বুক বড়ো আত্মিক
কি দারুণ! ভালোবাসা পরস্পর,
তবুও নীল আকাশের নিচে পাহাড় বা সমতল,
নদী বা মরুদ্যান, বাস্তব বা বিম্ব,
দিনের হৈ চৈ সেরে ডোবে রাতের অন্ধকারে।
বিনম্র পথে জীবনের ওলিগলি খোঁজে স্বপনের নির্যাস,
কুকুর আর অনাথ শিশুর কাঁপন ধরানো পেট
সমান্তরালে টানে ফুটপাত।
দরিদ্রের পিঠের ঝুলি কেড়ে ধনীরা টানছে পেটে
এ কেমন সুবিচার সাধুর ভবে?

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ই জানুয়ারি ২০২০ শাহ্‌জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ এখন বহির্বিশ্বে রোল মডেল

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর বুকে শান্তিপূর্ণ উন্নয়নশীল একটি দেশ। দারিদ্র্য নিরসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। ৮ই জানুয়ারি ২০২০ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ওপর। অর্থনীতিবিদদের ধারণা, ২০২৪ সাল নাগাদ এ হার হবে ১০ শতাংশের ওপর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সময় এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যাওয়ার। সময় এখন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার, পথ চলার। দেশের উন্নয়ন অগযাত্রায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের মানুষের অবদান খুবই প্রশংসনীয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, যে-কোনো দেশের উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনে তরুণ সমাজই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং আজ তোমরা যারা গ্র্যাজুয়েট হলে, আমার সামনে এই যে তরুণ প্রজন্ম, তোমরা এক একটি আলোর প্রদীপ। তোমাদের সকলকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় এগিয়ে আসতে হবে। তোমাদের মেধা ও শ্রমেই গড়ে উঠবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, দেশে আইনের শাসন সুসংহত ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। ৯ই জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি। অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থায়ী রূপ পেতে পারে না। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন ও অব্যাহত আর্থসামাজিক উন্নয়নে সব রাজনৈতিক দল, শ্রেণি ও পেশা নির্বিশেষে সবার ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, জাতীয় সংসদ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন এবং জাতির অগ্রযাত্রার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা সফল বাস্তবায়নে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। অধিবেশনে ১৬৩ পৃষ্ঠার ভাষণে রাষ্ট্রপতি অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২০শে জানুয়ারি ২০২০ গাজীপুরের মৌচাকে বেলুন উড়িয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের '৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী' অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। তাই ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা-২০২০' উপলক্ষে ১৫ই জানুয়ারি দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। বাণীতে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিস্তার টেলিযোগাযোগ খাতের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল বাংলাদেশের সব অঞ্চলের জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করেছে, যা ইতোমধ্যে অনেকাংশেই বাস্তবায়িত হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে ১৬ থেকে ১৮ই জানুয়ারি-২০২০ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জানুয়ারি ২০২০ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০-এর উদ্‌বোধন শেষে 'বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন' পরিদর্শন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী রপ্তানি আয় বাড়াতে পণ্য বৈচিত্র্যে জোর দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোতে নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি করার জন্য বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি উপস্থিত কূটনৈতিক ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

পুলিশবাহিনীকে জনগণের পুলিশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ প্যারেড গ্রাউন্ডে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী পুলিশবাহিনীকে জনগণের পুলিশ হিসেবেই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে যে-কোনো ধরনের অপরাধ দমন করা সহজ এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিশবাহিনীকে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য মোকাবিলায় পুলিশবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাঁর সরকার এই বাহিনীকে আধুনিক ও জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরে তিনি পুলিশবাহিনীর সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও পুলিশ পদক সেবা এবং রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক সেবায় ভূষিতদের মাঝে পদক প্রদান করেন।

সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯' উপলক্ষে আয়োজিত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী ছোটো শিশু থেকে শুরু করে তরুণ সমাজকে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক থেকে শুরু করে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছেলেমেয়েরা অনেক সময় বিপথে চলে যায়। অনেক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, অনেক ধরনের অপরাধের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে পড়ে। এটা যেন না হতে পারে সেজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া ইন্টারনেটে ক্ষতিকর ডিজিটাল কনটেন্ট ফিল্টারিং করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়া ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো কিছু শেয়ার বা পোস্ট না করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০১৯ সম্মাননা প্রদান করেন।

পণ্যের বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার খোঁজার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০১৯' ও 'বহুমুখী বস্ত্র মেলা'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি নতুন বাজার খুঁজে বের করার আহ্বান জানান। পোশাক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই জানুয়ারি ২০২০ রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এ 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২০' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন–পিআইডি

ব্যবসায়ীদের বাজার সম্প্রসারণ ও বস্ত্র খাতের প্রসারের জন্য বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষির পরামর্শ দেন এবং মুদ্রাস্ফীতিও কমাতে চান। বিশ্ববাজারের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রেখে টেক্সটাইল পণ্যগুলোর বৈচিত্র্যকরণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র খাতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯টি সংস্থা ও উদ্যোক্তার মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন।

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই জানুয়ারি তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার সূচনা অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর লোগো উন্মোচন এবং ঘড়ি চালুর মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করা হয়। এরপর প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও পাবলিক স্থানে একইসঙ্গে ক্ষণগণনা শুরু হয়। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বিজয়ী জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ কখনো মাথা নত করে না, করবেও না, উন্নত জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে দেশের মানুষ মাথা উঁচু করে চলছে– এই হোক আজকের দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

আবুধাবিতে সাসটেইনেবল উইকে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই জানুয়ারি আবুধাবি সাসটেইনেবল উইক, জায়েদ সাসটেইনেবল অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ৩ দিনের সরকারি সফরে আবুধাবি যান। ১৩ই জানুয়ারি সকালে প্রধানমন্ত্রী আবুধাবি ন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারের আইসিসি হলে 'আবুধাবি সাসটেইনেবলিটি ২০২০' এবং 'জায়েদ সাসটেইনেবলিটি উইক অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি'তে যোগ দেন। অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারক, শিল্প বিশেষজ্ঞ, অগ্রণী প্রযুক্তিবিদ ও পরবর্তী প্রজন্মের সাসটেন্যাবলিটি নেতার মিলন মেলায় পরিণত হয়। আবুধাবির যুবরাজ শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও আরো ৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিরিবাতির ইউতান তারাওয়া ইয়েতা জুনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। স্কুলটি গ্লোবাল হাইস্কুল ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার পায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউএই'র প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম এবং আবুধাবির যুবরাজ ও ইউএই'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্টের পত্নী শেখ ফাতিমা বিনতে মুবারক আল কেতবির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি রাতে আরব আমিরাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার, দেশীয় পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স প্রেরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করতে রাষ্ট্রদূতদের বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ১৪ই জানুয়ারি সফর শেষে দেশে ফেরেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

গণমাধ্যম খাতে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভাদকার (Prakash Javadekar) ১৪ই জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ বেতার ও ভারতের আকাশবাণী বেতারের মধ্যে অনুষ্ঠান বিনিময় কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। গত বছরের ২রা সেপ্টেম্বর সারা ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরুর সাড়ে তিন মাসের মাথায় এবার সারা ভারতে শোনা যাবে বাংলাদেশ বেতারও। এর ফলে এখন থেকে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান আকাশবাণী চ্যানেলে কলকাতায় এফএম ১০০.১ মেগাহার্টজ, আগরতলায় এফএম ১০১.৬ মেগাহার্টজ এবং আকাশবাণী অ্যাপ ও ডিটিএইচের মাধ্যমে সারা ভারতে ভারতীয় সময় সকাল ৭.৩০ থেকে ৯.৩০ এবং সন্ধ্যা ৫.৩০ থেকে ৭.৩০-এ একযোগে সম্প্রচার করা হবে। একই সময়ে আকাশবাণী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের এফএম ১০৪ মেগাহার্টজে সম্প্রচার করা হবে। ২০১৮ সালের ৯ই এপ্রিল প্রসার ভারতী ও বাংলাদেশ বেতারের

মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে এ কার্যক্রমের সূত্রপাত দু'দেশের গণমাধ্যম খাতে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। এর পরপরই দু'দেশের তথ্যমন্ত্রীদ্বয় বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে দু'দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২১শে জানুয়ারি ২০২০ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির নবনির্বাচিত পরিষদের সাথে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ২০২০ সালে বেতার ও চলচ্চিত্র খাতে এই সহযোগিতা দু'দেশের জনগণ ও সরকারের বন্ধুত্বের এক অনন্য মাইলফলক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছেন, এই বিনিময় এবং চুক্তি তারই প্রতিফলন।

মন্ত্রী এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কথা স্মরণ করে বলেন, ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতো না।

ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভাদকার বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ভৌগোলিক নৈকট্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত। গণমাধ্যম ক্ষেত্রের এই সহযোগিতা দু'দেশের অন্যান্য খাতে সহযোগিতাকেও প্রসারিত করবে।

জাতি গঠনে গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নেতৃত্বে গত ১১ বছরে দেশে গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। কারণ, এ সরকার বিশ্বাস করে জাতি গঠনে গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০শে জানুয়ারি ঢাকায় বাংলা মোটরের রূপায়ন ট্রেড সেন্টারে দৈনিক দেশ রূপান্তর কার্যালয়ে তাদের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১১ বছর আগে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল সাতশ, যা এখন তেরোশ ছাড়িয়েছে, টেলিভিশন চ্যানেল ছিল ১০টি, এখন ৩৪টি টিভি সম্প্রচার হচ্ছে, রয়েছে হাজার হাজার অনলাইন পত্রিকা। দৈনিক দেশ রূপান্তর যেন তার শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করতে পারে, সে কামনা করে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আমি আশা করি, দেশ রূপান্তর পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে ২০৪১ সাল নাগাদ দেশকে শুধু উন্নত রাষ্ট্রই নয়, মেধা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বাণিজ্য মেলা উদ্‌বোধন

১লা জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সারা দেশে বই উৎসব

নতুন বছরের প্রথম দিন উপহার হিসেবে দেশের সাড়ে চার কোটি শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় ঝকঝকে নতুন পাঠ্যবই। দেশের প্রতিটি স্কুল-মাদ্রাসার মাঠে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়

জাতীয় সবজি মেলা ২০২০

৩রা জানুয়ারি: ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩-৫ই জানুয়ারি 'জাতীয় সবজি মেলা ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্‌বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক। এবারের এ মেলার প্রতিপাদ্য ছিল– 'পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ সবজি'

পুলিশ সপ্তাহ উদ্‌বোধন

৫ই জানুয়ারি: রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে পুলিশ সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার'-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আনন্দ মুখর পরিবেশে পাঁচ দিনব্যাপী পুলিশ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

৭ই জানুয়ারি: বর্তমান সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় শপথ নিতে দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই জানুয়ারি ২০২০ গণভবন থেকে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্যায়ে আখেরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

একনেকে ৭ প্রকল্প অনুমোদন

এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় মোট সাতটি প্রকল্পের অনুমোদন লাভ করে। এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ১১ হাজার ৪২ কোটি টাকা

ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আব্দুল্লাহ ১লা জানুয়ারি বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের বই উৎসব-২০২০' অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন–পিআইডি

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন

৮ই জানুয়ারি: নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস'। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ইন্টারনেটে কিছু আপলোড হলেই সেটি শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা ঠিক নয়। সঠিক তথ্য যাচাই করে নেওয়া দরকার

মন্ত্রিসভার বৈঠক

তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় বৃদ্ধি করে এ সংক্রান্ত আইনের খসড়ায় নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়

জাতীয় বস্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৯ই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০১৯' এবং বস্ত্রমেলার উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা বাড়াতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণ এবং বস্ত্র খাত প্রসারে ক্রেতাদের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব দরাদরি করে পণ্যের উপযুক্ত মূল্য আদায়েও ব্যবসায়ীদের মনোযোগী হতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

১০ই জানুয়ারি: নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করে তাঁর কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যে বিজয়ের আলোকবর্তিকা তিনি আমাদের হাতে দিয়েছেন, সেই মশাল নিয়েই আমরা আগামী দিনে চলতে চাই। বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে চাই

ভিটামিন এ ক্যাপসুল

১১ই জানুয়ারি: জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশে দুই কোটির বেশি শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি শিশুকে একটি করে নীল রঙের এবং ১২ থেকে ৯ মাস বয়সি শিশুকে একটি করে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়

বিশ্ব ইজতেমা

১২ই জানুয়ারি: মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমার ৫৫তম আয়োজনের প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় পর্বের মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে জানুয়ারি

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার উদ্‌বোধন

১৬ই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনের ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

১৯শে জানুয়ারি: জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো অষ্টাদশ 'ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২০'। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭৪টি দেশের

২২০টি চলচ্চিত্র নিয়ে একযোগে রাজধানীর নয়টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত নয় দিনের উৎসবটির পর্দা নামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এবারের উৎসবের স্লোগান ছিল– নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২০শে জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সরকারি চাকরিতে নন-ক্যাডার অষ্টম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা থাকবে না এ সংক্রান্ত পরিপত্র সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়

একনেকে ৭ প্রকল্প অনুমোদন

২১শে জানুয়ারি: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সাতটি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। এসব প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২২ হাজার ৪৬ কোটি টাকা

ই-পাসপোর্ট জাতির জন্য মুজিববর্ষের উপহার প্রধানমন্ত্রীর

২২শে জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট এবং স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উদ্‌বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এটা (ই-পাসপোর্ট) জাতির জন্য মুজিববর্ষের একটি উপহার

জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস

২৩শে জানুয়ারি: বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) কর্তৃক ২৪তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়

ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান দিবস

২৪শে জানুয়ারি: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান দিবস

খেলাধুলার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক গড়তে চাই

২৫শে জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার চায় খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এদেশের ছেলেমেয়েরা এগিয়ে যাক। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক, তিনি সেটাই চান। এলক্ষ্য নিয়ে প্রাথমিক স্কুল পর্যায় থেকেই মেয়েদের জন্য বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ছেলেদের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করা হয়

আন্তর্জাতিক কাষ্টমস দিবস পালিত

২৬শে জানুয়ারি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'রাজস্বের প্রবৃদ্ধি টেকসই সমৃদ্ধি'

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার, দেশীয় পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি এবং তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আবুধাবির হোটেল শাংরি লায় ১৪ই জানুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যের ৯টি দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতদের বলেন, আমরা শান্তি চাই। আমরা শান্তিতে বসবাস করতে চাই। যারা অস্ত্র বানায় তারা অস্ত্র বিক্রির একটা বাজার তৈরি করে। দেখা যায়, মুসলিম দেশের জনগণই তার শিকার হয়। মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও রপ্তানি কীভাবে বাড়ানো যায় কোন দেশে কোন পণ্যের চাহিদা কেমন, সেসব বিষয় কাজ করতে হবে রাষ্ট্রদূতদের। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে হবে।

প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স প্রেরণের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকরা প্রায়ই প্রতারণার শিকার হয়। তাদের প্রত্যেকেই নিরাপত্তার জন্য সম্মিলিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। বিদেশে চাকরি প্রার্থী কোনো ব্যক্তি যেন প্রতারণার শিকার না হয়, সেজন্য ব্যাপক প্রচারণার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। বিদেশে চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে সরকারি রেটের বাইরে অন্য কোনো প্রকার চার্জ গ্রহণ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বে চতুর্থ বাংলাদেশ

চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে-এ পূর্বাবাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি বলছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে ৭ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপির প্রবৃদ্ধির হতে পারে। বাংলাদেশের ওপারে থাকবে ক্যারিবীয় দেশ গায়না, আফ্রিকার রুয়ান্ডা ও জিবুতি। ৯ই অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস ২০২০' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রবৃদ্ধির বৈশ্বিক এ পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ, গত অর্থবছরে এখানে ৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তখন অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি আয়ে বেশ প্রবৃদ্ধি ছিল। সুসংহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পরিকল্পনা মাফিক বড়ো প্রকল্পে বিনিয়োগ, ব্যবসায় সহজ করার নানা উদ্যোগ ইত্যাদি বিবেচনা করেই এই বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

প্রতিবেদক: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

চা উৎপাদনে রেকর্ড

সর্বোচ্চ চা উৎপাদনে রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। ১৬৬ বছরের ইতিহাসে এবার সর্বকালের চলতি মৌসুমে ৮ কোটি ৫০ লাখের অধিক কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে; যা ২০১৬ সালের ৮ কোটি ৫০ লাখ কেজি রেকর্ড উৎপাদনকে পেছনে ফেলে বছর শেষে ৯ কোটি লাখে পৌঁছাবে। চা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, চা উৎপাদনের ইতিহাসে ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ ৮ কোটি ৫০ লাখ কেজি চা উৎপাদিত হয়। ২০১৮ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮ কোটি ২০ লাখ কেজি উৎপাদন হয়। কিন্তু চলতি বছরে ইতোমধ্যে ৮ কোটি ৫০ লাখ কেজির অধিক চা উৎপাদন হয়েছে। বছর শেষে উৎপাদন দাঁড়াবে ৯ কোটি কেজি। এটি সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড। চা উৎপাদনে বাংলাদেশ হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। চা উৎপাদনের রেকর্ড নিয়ে চা বাগান সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সঠিক সময়ে কীটনাশক ব্যবহার, অনুকূল আবহাওয়া, পুরাতন বাগানে নতুন করে আবাদ, সরকারের সহযোগিতায় এবং অনাবাদি জমিতে চা চাষের কারণে উৎপাদনে এই সফলতা এসেছে।

১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়া চা বাগানে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়। দেশ স্বাধীনের সময় দেশে চা বাগানের সংখ্যা ছিল ১৫০টি। তখন ৩ কোটি কেজির মতো চা উৎপাদন হতো। বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৬টিতে। এর মধ্যে মৌলভীবাজারে রয়েছে ৯২টি চা বাগান। বাকিগুলো হবিগঞ্জে ২৪টি, সিলেটে ১৯টি, চট্টগ্রামে ২২টি, পঞ্চগড়ে সাতটি, রাঙ্গামাটিতে দুটি ও ঠাকুরগাঁওয়ে একটি। এসব বাগানে মোট জমির পরিমাণ ২ লাখ ৭৯ হাজার ৪৩৯ একর।

সীমান্ত অপরাধ দমনে মোবাইল অ্যাপস 'রিপোর্ট টু বিজিবি'

সীমান্ত অপরাধ দমনে 'রিপোর্ট টু বিজিবি' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ১৫ই জানুয়ারি থেকে এই অ্যাপসটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে বিজিবি'র সদর দফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে বিজিবি দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অ্যাপসটির উদ্‌বোধন করেন।

বিজিবি'র সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সীমান্ত সুরক্ষা, সীমান্ত হত্যা, মানবপাচার, মাদকপাচার, চোরাচালান, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী আক্রমণ, সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াচ এবং গ্রেফতারসহ যে-কোনো সীমান্ত অপরাধ বিষয়ে বিজিবি যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে সে জন্য এই অ্যাপস চালু করা হয়েছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে বিজিবি সদর দফতর 'রিপোর্ট টু বিজিবি' নামে মোবাইল অ্যাপসটি তৈরি করা হয়। এই অ্যাপস্-এর মাধ্যমে দেশের যে কেউ যে-কোনো স্থান থেকে মোবাইলের মাধ্যমে অতি দ্রুততার সঙ্গে সীমান্ত অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য বা প্রতিবেদন পাঠাতে পারবেন।

যেভাবে এই অ্যাপস ব্যবহার করতে হবে

অ্যাপসটিতে অপরাধের ধরন (সীমান্ত হত্যা, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য, চোরাচালান, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী আক্রমণ, সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াচ, গ্রেফতার ও অন্যান্য) থেকে তথ্য অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। এরপর ব্যবহারকারীকে ক্যামেরা আইকনে ক্লিক করে অপরাধ দৃশ্যের ছবি তুলতে হবে অথবা গ্যালারি হতে অপরাধ দৃশ্যের ছবি নির্বাচন করতে হবে। অপরাধের দৃশ্যটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে হবে। অপরাধ সংগঠিত হওয়ার জেলা এবং থানা নির্বাচন করতে হবে। তথ্য প্রদানকারী তার ইচ্ছা হলে নিজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিতে পারবেন তবে তা ঐচ্ছিক। এরপর সেন্ড করতে হবে।

বিজিবি দিবসে মোবাইল অ্যাপস রিপোর্ট টু বিজিবি উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ই-পাসপোর্টের যুগে বাংলাদেশ

বহুল প্রতীক্ষিত ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্ট পরিসেবা ও স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২২শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। এর আগে ১৯শে জানুয়ারি ই-পাসপোর্ট উদ্‌বোধন উপলক্ষে ইমিগ্রেশন এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তরের (ডিআইপি) কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর ছবি তুলে নিয়ে যান।

প্রাথমিকভাবে উত্তরা, যাত্রাবাড়ী ও আগারগাঁও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট সেবা শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে ৭২টি আঞ্চলিক ও বিভাগীয় অফিস এবং ৮০টি বিদেশি মিশনে চালু করা হবে। জার্মান সংস্থা ভেরিডোস জিএমবিএইচ দেশে ই-পাসপোর্ট ও ই-গেটে কাজ করছে।

'বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার' প্রকল্পটি ৪ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিআইপি পুরো প্রকল্পটি সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে। ১০ বছরে মোট ৩০ মিলিয়ন পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট সেবার সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনের মাধ্যমে অভিবাসনের আনুষ্ঠানিকতারও পুরো প্রক্রিয়া শেষ হবে। জার্মানিতে দুই মিলিয়ন ই-পাসপোর্ট তৈরি করা হবে। যাঁরা প্রথমে আবেদন করবেন, তাঁদের পাসপোর্ট জার্মানি থেকে তৈরি করা হবে। ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে ৫ ও ১০ বছরের জন্য।

বাংলাদেশে দুই ধরনের ই-পাসপোর্ট দেওয়া হবে। একটি ৪৮ পাতার, অন্যটি ৬৪ পাতার। সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরির জন্য তিন ধরনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪৮ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ পাসপোর্টের ফি ৩৫০০ টাকা, জরুরি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা এবং অতি জরুরি সাড়ে সাত হাজার টাকা ফি দিতে হবে। এছাড়া ৪৮ পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদের ক্ষেত্রে সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি ফি যথাক্রমে পাঁচ হাজার, সাত হাজার ও নয় হাজার টাকা।

একইভাবে ৬৪ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ পাসপোর্টের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি সাত হাজার ৫০০ এবং অতি জরুরি বাবদ ১০ হাজার ৫০০ টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদের ক্ষেত্রে সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি ফি যথাক্রমে সাত হাজার, নয় হাজার ও ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাধারণ পাসপোর্ট ও ই-পাসপোর্টের মধ্যে পার্থক্য হলো, এতে মোবাইল ফোনের সিমের মতো ছোটো ও পাতলা আকারের ইলেকট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ যুক্ত থাকবে। এ চিপ পাসপোর্টের একটি বিশেষ পাতার ভেতরে স্থাপন করা থাকবে। ফলে পাতাটি সাধারণ পাতার চেয়ে একটু মোটা হবে। চিপে সংরক্ষিত বায়োমেট্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করে পাসপোর্ট বহনকারীর পরিচয় শনাক্ত করা যাবে।

ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ায় একজনের নাম-পরিচয় ব্যবহার করে অন্য কেউ আর পাসপোর্ট করতে পারবে না। ফলে পাসপোর্ট নকল হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। সাধারণ পাসপোর্টের তুলনায় ই-পাসপোর্টে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যও বেশি। এতে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেকগুলো লুকায়িত অবস্থায় থাকবে।

৩ দিনব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা

'বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রযুক্তির মহাসড়ক'– প্রতিপাদ্য সামনে রেখে দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা। ১৬ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী এই মেলা। তিন দিনের এ মেলার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোম্পানি রকমারি আলোকসজ্জায় সাজিয়েছে তাদের স্টলগুলো। মেলায় আগত বেশিরভাগ দর্শনার্থী আসে নতুন পণ্য বা ডিভাইসের সন্ধানে। অনেকেই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কিনেছেন বিশেষ ছাড়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে জানুয়ারি ২০২০ গণভবনে ই-পাসপোর্ট-এর জন্য ই-স্বাক্ষর প্রদান করেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিনামূল্যের বই বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে জানুয়ারি গণভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য সারা দেশে বিনামূল্যের বই বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষাকে আরো আধুনিক, উন্নত এবং বিজ্ঞানসম্মত

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১১ই জানুয়ারি ২০২০ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন–পিআইডি

করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কারিগরি শিক্ষার ওপরও জোর দেন। যাতে একজন ছেলে বা মেয়ে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেরা কিছু করতে পারে। তিনি শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান যেখানে থাকবে না কোনো দারিদ্র্য, বৈষম্য। থাকবে উন্নত সমাজব্যবস্থা। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে খেলায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে ১২ই জানুয়ারি ২০২০ দেশের ১৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক উদ্‌বোধন করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

জেএসসি ও জেডিসি, প্রাথমিক ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ

জেএসসি ও জেডিসি, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯, গণভবনে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলের অনুলিপি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলের অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ২৬ লাখ ২ হাজার ৫৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং পাস করে ২২ লাখ ৯৭ হাজার ২৭১ জন। পাশের হার ৮৭.৯% শতাংশ জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৮ হাজার ৪২৯ জন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ২৪ লাখ ৫৪ হাজার ১৫১ জন। পাস করেছে ২৩ লাখ ৪৩ হাজার ৭৪৩ জন এবং পাসের হার ৯৫.৫০ শতাংশ। ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ লাখ ২৬ হাজার ৮৮ জন।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচারণা চালাতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করা লজ্জাজনক বিষয়। তাই সকল পর্যায়ে পরীক্ষায় অসাধু উপায়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ১১ই জানুয়ারি ২০২০ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় আরো বেশি সচেতন হতে হবে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত থেকে বাঙালি সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে আমাদের সবাইকে তৎপর ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের সংস্কৃতিই আমাদেরকে খুলে দেবে চেতনার দরজা। তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে জোরালোভাবে এখনই এগিয়ে আসতে হবে।

১৪৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেটওয়ার্ক উদ্‌বোধন

দেশের ১৪৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০ মেগাবাইট গতিসম্পন্ন নেটওয়ার্ক চালুর কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। ১২ই জানুয়ারি সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এ কার্যক্রম চালুর উদ্‌বোধন করেন।

শিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে প্রয়োজনে তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ২১শে জানুয়ারি এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ নির্দেশ দেন। সভায় উপজেলা পর্যায়ে ২০ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদন হয়।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

৫ দেশের সঙ্গে বিএফআইইউর এমওইউ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে তথ্যবিনিময়ের জন্য পাঁচটি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। মরিশাসে অনুষ্ঠিত এগমন্ট গ্রুপের বৈঠক চলাকালে ২৯শে জানুয়ারি এই এমওইউ সই হয়। দেশগুলো হলো– মরিশাস, ইকুয়েডর, লাটভিয়া, অ্যান্ডোরা ও সেশেলস। ৫ই জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সমঝোতা স্মারকে বিএফআইইউর পক্ষে নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউর উপপ্রধান মো. ইস্কান্দার মিয়া এবং উল্লিখিত দেশের এফআইইউর পক্ষে ওই দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইউনিটের প্রধানরা স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, এসব সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে মরিশাস, ইকুয়েডর, লাটভিয়া, অ্যান্ডোরা ও সেশেলসের সঙ্গে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধবিষয়ক তথ্যবিনিময় আরো সহজ হবে। এসব স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিএফআইইউর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী এফআইইউর সংখ্যা দাঁড়াল ৭৭টি।

সেরা ১৫ খামারিকে পুরস্কৃত করল প্রাণ ডেইরি

প্রকৃত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ দুধ উৎপাদনে খামারিদের উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে নিজস্ব চুক্তিভিত্তিক চাষিদের পুরস্কৃত করেছে প্রাণ ডেইরি লিমিটেড। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামার পরিচালনা, দীর্ঘ সময় ধরে প্রাণ ডেইরিকে দুধ সরবরাহ, ক্ষুদ্র খামার থেকে বৃহৎ খামার গড়ে তোলাসহ পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রাণ ডেইরি চুক্তিভিত্তিক খামারিদের মধ্যে ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ৮ই জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার গঙ্গাপ্রাসাদ প্রাণ ডেইরি কমপ্লেক্সে কৃষকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু। তিনি দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও খামারিদের সহজে ঋণ প্রদানে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নতুন প্রযুক্তিতে জুস তৈরি

আমের জুস ও কোমল পানীয় তৈরিতে অত্যাধুনিক মেশিন স্থাপন করে উৎপাদন শুরু করেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ পানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। এ লক্ষ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে নিজস্ব কারখানায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে অ্যাসেপটি প্রযুক্তি চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। মূলত প্রতিষ্ঠানটির ফ্রুটিকা ব্র্যান্ডের জুস উৎপাদনে প্রাথমিকভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি এশিয়ায় এ ধরনের প্রযুক্তি এটিই প্রথম। আমের পাল্প (মন্ড) থেকে পরবর্তী পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং প্যাকিং এ প্রযুক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে। ফলে কোনো ধরনের জীবাণু-এর সংস্পর্শে আসতে পারে না। আসেপটিক প্রযুক্তিতে পানীয় জীবাণুমুক্ত রাখতে তরল পণ্যকে জীবাণুমুক্ত পাত্রে রেখে প্যাকেট বা বোতলজাত করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্যাকেজিং বা বোতলজাত করণের সময় কোনো ধরনের বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। ফলে আমের পাল্প থেকে উৎপাদিত জুসের গুণমান ৯ মাস পর্যন্ত ঠিক থাকে। এছাড়া একই প্রক্রিয়ায় আম থেকে পাল্প তৈরি করা হয়। ফলে কোনো ধরনের প্রিজারভেটিভ (সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কেমিক্যাল) ছাড়া দুই বছর পর্যন্ত ঐ পাল্প নিরাপদ থাকে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-কানাডা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশ-কানাডা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে। এতে করে বিজনেসম্যান টু বিজনেসম্যান (বিটুবি) আলোচনার জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি হবে। এছাড়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগে গতি আসবে। বাংলাদেশে এগ্রো প্রসেসিং জোন গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, কানাডা এ খাতে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবে। বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ৬ই জানুয়ারি ২০২০ তাঁর দপ্তরে ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত Benoit Prefontaine সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কানাডার রাষ্ট্রদূত বলেন, কানাডা বাংলাদেশের সাথে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে একমত। কানাডার ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী। বাংলাদেশ দৃশ্যমান উন্নয়ন করছে। কানাডা বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশীদার হতে আগ্রহী। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হলে কানাডা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য সহযোগিতা প্রদান করবে। বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে, কানাডা এ সুযোগ নিতে চায়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন, ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) তপন কান্তি ঘোষ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) শরিফা খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কসোভোর বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। এখানে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি বিশেষ

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ২২শে জানুয়ারি বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে 'ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিবিশন (ইন্ডি) বাংলাদেশ ২০২০'-এর উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন–পিআইডি

অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, কসোভোর বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, আইসিটিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে লাভজনক বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী ১৪ই জানুয়ারি ২০২০ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত Guner Ureya-এর সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। কসোভোর বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কসোভোর বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ২২শে জানুয়ারি ২০২০ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য প্রদর্শনী 'ইন্ডি বাংলাদেশ ২০২০'-এর উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ একটি পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা দেবে বলে উল্লেখ করে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করে উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানির সুবিধা নিতে সে দেশের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের সহায়তায় ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ইইপিসি)-এর আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুনতাকিন আশরাফ, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রভি শেহগাল ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মহেশ কে. দেশাই বক্তব্য রাখেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ অত্যন্ত উদার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার আকর্ষণীয় প্রণোদনাসহ ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিডা প্রাথমিক তথ্য সেবা থেকে শুরু করে নিবন্ধন পর্যন্ত সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে। ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় অনেক স্বনামধন্য উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার নানাভাবে উৎসাহিত করছে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার নানাভাবে উৎসাহিত করছে। বিভিন্ন কোম্পানির আগ্রহকেও স্বাগত জানানো হয়। নিরাপদ বিনিয়োগের স্থান হিসেবে ইতোমধ্যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিমন্ত্রী ২২শে জানুয়ারি ২০২০ ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পার্তামিনা কর্তৃক বাংলাদেশে পার্তামিনা লুব্রিক্যান্ট বাজারজাতকরণের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি রাবাব ফাতিমা

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশে স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা সর্বসম্মতিক্রমে ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৪ই জানুয়ারি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইউনিসেফের

নির্বাহী বোর্ড ব্যুরোর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় ফলে এখন থেকে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফের কর্মকাণ্ডে কৌশলগত দিক নির্দেশনা দিতে পারবে। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা সম্প্রতি জাতিসংঘে স্থায়ী মিশনে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

বাসে বসানো হবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা

গণপরিবহণে নারীর যাতায়াত নিরাপদ করতে বাসে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক

মন্ত্রণালয়। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৯ই জানুয়ারি ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে গণপরিবহণে নারীর যাতায়াত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দিপ্ত ফাউন্ডেশন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করবে দিপ্ত ফাউন্ডেশন। এর আওতায় প্রথম পর্যায়ে এবছর ৫০টি ও পরবর্তী পর্যায়ে ১৫০টি গণপরিবহণে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। সেগুলো মন্ত্রণালয় ও দিপ্ত ফাউন্ডেশনের সার্ভারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। পর্যায়ক্রমে সব গণপরিবহণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশে বেতারের প্রথম নারী মহাপরিচালক

বাংলাদেশ বেতারের প্রথম নারী মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির উপ-মহাপরিচালক বেগম হোসেনে আরা তালুকদারকে। ১৪ই ডিসেম্বর এ বিষয়ে তথ্য

মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি এ পদে যোগদান করেন। বেতারের ওয়েবসাইটে বলা হয়, বিসিএস তথ্য ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের এই কর্মকর্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের চার কন্যা

যুক্তরাজ্যে ১২ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চার কন্যা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে রুশনারা আলী টানা চতুর্থবার, টিউলিপ সিদ্দিক ও রূপা হক টানা তৃতীয়বার এবং প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন আফসানা বেগম। চারজনই জয় পেয়েছেন লেবার পার্টি থেকে। সিলেটের বিশ্বনাথে জন্ম নেওয়া রুশনারা টাওয়ায় হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসন থেকে বিপুল ভোটে চতুর্থবারের মতো জয়লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ণ আসন থেকে টানা তৃতীয় বার নির্বাচিত হন।

কিংসটন ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক রূপা হক ও টানা তৃতীয় মেয়াদে জয় পেয়েছেন। তিনি লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার আদি বাড়ি পাবনায়। টাওয়ায় হ্যামলেটস্ এলাকার পপলার অ্যান্ড লাইমহাউস আসন থেকে প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়েই বিপুল ভোটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশের আরেক মেয়ে আফসানা বেগম। তার বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বাড়ি করার জন্য ১৬ লাখ টাকা করে পাবেন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধারা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, প্রত্যেক অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে বাড়ি নির্মাণে ১৬ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। ১৭ই ডিসেম্বর শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে উৎসর্গকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার নুরুল ইসলাম খান রচিত 'মুক্তিযুদ্ধ এবং আমি' বইয়ের মোড়ক উন্মোচনকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে অনেক অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। মুজিববর্ষে আমরা সেসব অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ১৬ লাখ টাকা করে দিবে। মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহনির্মাণ তথা 'বীরভবন' তৈরির জন্য এসব টাকা তাদের হাতে দেওয়া হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় সামনে মুজিববর্ষে আমরা প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে তাদের নিজস্ব ১০ থেকে ২০ মিনিটের একটি বক্তব্য ধারণ করব। 'বীরের কণ্ঠে বীরগাথা' এ শিরোনামে এসব বর্ণনা নেব।

তিনি বলেন, 'এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পরবর্তী প্রজন্ম ও গবেষকরা মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠেই মুক্তিযুদ্ধের কথা থেকেই সত্যিকারের ইতিহাস বের করতে পারবেন। সে ইতিহাস জাতিকে সমৃদ্ধ করবে। কী অবস্থায় তারা যুদ্ধ করেছে এ বিষয়গুলো সংরক্ষণ থাকা উচিত'।

নতুন ঘর পাচ্ছে সিলেটের ১৩২ পরিবার

'যার জমি আছে ঘর নেই' সরকারের দুটি প্রকল্পের আওতায় সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় অসহায় ১৩২ পরিবার পাচ্ছে নতুন ঘর। উপজেলার ১০ ইউনিয়নে এ ঘরগুলো নির্মিত হচ্ছে। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আশ্রয়ণ ২-এর আওতায় 'যার জমি আছে ঘর নেই' তার নিজ জমিতে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১২০টি ঘর এবং দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 'দুর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হচ্ছে আরো ১২টি ঘর। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয়ে করা হচ্ছে ১ লাখ টাকা। ঘরগুলো পাকা খুঁটি ও ঢেউটিন দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া, ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ৩ লাখ টাকা। পাকা ঘরগুলোর দেয়ালপাকা ও চাল ঢেউটিন। এতে থাকছে ২টি রুম, ফ্লোরপাকা, বারান্দা, রান্নাঘর ও বাথরুম।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

সম্ভাবনাময় অন্যতম সেক্টর সবজি

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সবজি এদেশের একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর ও অর্থনীতির একটি বিশেষ দিক। এর মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা যাবে। শুধু গার্মেন্টসের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সরকার কৃষিসহ অন্যান্য সেক্টরকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে। ৩রা জানুয়ারি রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে জাতীয় সবজি মেলার সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমাদের কৃষিকে লাভজনক করতে হবে, এটাকে বহুমুখীকরণ করতে হবে। অন্যান্য মূল্যবান অপ্রচলিত ফসলগুলো উৎপাদন করতে হবে। সবজি উৎপাদনে একটু খরচ বেশি। তবে আমাদের বিজ্ঞানীরা এবং যারা সবজি নিয়ে কাজ করে, তারা মেলায় অনেকগুলো প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। একটু সময় লাগবে, আস্তে আস্তে খরচ কমে আসবে। যারা উৎপাদন করছে তারা এটাকে লাভজনক করার জন্য ফেরোমন, নিমসহ অন্যান্য জৈব উপাদান ব্যবহার করছে, যা মানুষের শরীরের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। সবজি উৎপাদনের প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে, শুধু বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি করতে পারব।

কৃষিমন্ত্রী এর আগে কেআইবি চত্বরের তিন দিনের জাতীয় সবজি মেলা ২০২০-এর উদ্‌বোধন করেন। তিনি এ সময় বিশেষ অতিথি ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মেলার বিভিন্ন স্টল ও প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখেন।

সরকার সহায়তা করবে তৈলবীজ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধিতে

দেশে তেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশব্যাপী উন্নত ও অধিক ফলনশীল সরিষার আবাদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্যতেল ফসল। সরিষা থেকে যে খৈল হয় তাতে প্রায় ৪০ শতাংশ আমিষ থাকে। দেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী নতুন নতুন তৈলবীজের জাত উদ্ভাবন করে ব্যাপক হারে আবাদ করতে হবে। দেশে তৈলবীজ চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সব ধরনের উপকরণ প্রদানে সহায়তা করবে সরকার। কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১৩ই জানুয়ারি জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায় সতপোয়ার গ্রামে উচ্চ ফলনশীল বারি সরিষা ১৪-এর আবাদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত 'মাঠ দিবস' অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। এর আগে মন্ত্রী সরিষার মাঠ পরিদর্শন করেন।

কৃষিমন্ত্রী জানান, সরিষাবাড়ীতে মোট ৪ লাখ ৭৭ হাজার হেক্টর জমিতে এই বারি সরিষা-১৪ চাষ করা হয়েছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন যা থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন তৈল উৎপন্ন হবে।

জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালার খসড়া অনুমোদন

জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ৮ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এ নীতিমালায় কৃষিযন্ত্র কিনতে কৃষকের ঋণ সুবিধা দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ায় দেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পরিধি আরো সম্প্রসারিত হবে। এ নীতিমালার আওতায় কৃষক সাশ্রয়ী মূল্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষিযন্ত্র কেনার সুযোগ পাবেন। এছাড়া সহজ শর্তে ও ন্যূনতম সুদে বা সুদবিহীন ঋণ সুবিধা পাবেন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আধুনিক জব পোর্টাল চালু হবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১১ই জানুয়ারি আগারগাঁওস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মিলনায়তনে 'প্রতিবন্ধীদের চাকরি মেলা ২০২০'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আইসিটি বিভাগ থেকে মুজিববর্ষে একটি আধুনিক জব পোর্টাল চালু করা হবে। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ভিডিও কলের মাধ্যমে দেশের বা বিদেশের যে-কোনো স্থান থেকে ইন্টারভিউ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষমদের সাথে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, সরকার বিশেষভাবে সক্ষমদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে 'প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন' প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য দূর করা সম্ভব উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের ২৮টি হাইটেক

পার্কে 'ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বিশেষভাবে সক্ষমগণ প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম এবং দেশীয় এনজিও সিএস আইডি-এর নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহিরুল আলম ও প্রকল্প পরিচালক এনামুল কবির।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ২২শে জানুয়ারি ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সরকার শহরের নারীদের দারিদ্র্য দূর করতে কাজ করছে

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নারীরা ২০৩০ সালের এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার শহরের নারীদের দারিদ্র্য দূর করতে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, সুবিধাবঞ্চিত নারীরা শুধু গ্রামে নয়। শহরে অনেক নারী আছে যারা এ রকম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। প্রতিমন্ত্রী ১২ই জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় মহিলা সংস্থার অডিটোরিয়ামে নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম অ্যাডভোকেটের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কাজল ইসলাম ও অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্প প্রকল্প পরিচালক নরুন নাহার হেনা।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে

১৬ই জানুয়ারি ২০২০ বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি পণ্যকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয়ভাবে বছরজুড়ে এসএমই পণ্যমেলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলো এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন, এসএমই পণ্যের প্রচার আরো বাড়াতে হবে। দেশের ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। এজন্য দেশের তরুণ ও যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে। বান্দরবান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন পুলিশ জেরিন আখতার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের ম্যানেজার রাহুল বড়ুয়া প্রমুখ।

সরকারি কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে

২২শে জানুয়ারি ২০২০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি জাতি কতটা উন্নত হবে তা নির্ভর করে ওই জাতিতে কত বেশি কর্মদক্ষ জনসম্পদ রয়েছে তার ওপর। বঙ্গবন্ধু এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এদেশের মানুষকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আমাদেরও জাতির পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় সরকারি কর্মচারীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সময় মত এবং সঠিকভাবে পালন করে দেশকে আরো সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানান। তিনি এ সময় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জড়িত সকলকে দক্ষ জনসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

উৎপাদন শুরু পায়রা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে

পায়রা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। ১৩ই জানুয়ারি কেন্দ্রটি জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ১০০ মেগাওয়াট লোডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালের ৩০শে মার্চ। রাষ্ট্রীয় নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি এবং চীনের ন্যাশনাল মেশিনারি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট করপোরেশন যৌথভাবে নির্মাণ করে এটি। দুই বিলিয়ন ডলার বা ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত এই কেন্দ্রের সহায়তা দিয়েছে চীনের এক্সিম ব্যাংক। কেন্দ্রটি নির্মাণে এনডব্লিউপিজিসিএল এবং সিএমসি যৌথভাবে বিসিপিসিএল গঠন করেছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের অপর ইউনিট উৎপাদনে আসবে আগামী মে মাসে।

আলোকিত যমুনার চরাঞ্চল

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার নাটুয়ারপাড়া চরেরগুলের মোড় থেকে শুরু করে পুরো হাটবাজার এলাকায় অবস্থিত ছোটো-বড়ো সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাটের চালার ওপরে বসানো হয়েছে সোলার প্যানেল। অসংখ্য বসতবাড়ির চিত্রও একই।

সিরাজগঞ্জের যমুনার চরাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় অসংখ্য সোলার প্যানেল। চরাঞ্চলের বসতবাড়ি, হাটবাজার, সরকারি-বেসরকারি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ছোটো-বড়ো বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ঘরের চালে সোলার প্যানেল। এমনকি মোবাইল ফোন টাওয়ারও চলছে এই প্যানেলের শক্তিতে। ২০২১ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে।

সোলারের আলোয় আলোকিত হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত যমুনা চরের মানুষ। দিনের সূর্যের আলো সংগ্রহ করে রাতের অন্ধকার দূর করছেন দুর্গম যমুনা চরের প্রায় ২ লাখ মানুষ। বদলে গেছে চরের মানুষের জীবন যাত্রা। দুর্গম চরাঞ্চল এখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

সৌরবিদ্যুতের আলোয় জেলেদের জীবনের পরিবর্তন

প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মানুষের জীবন অনেকখানি বদলে গেছে। সৌরবিদ্যুতের আলোয় মেঘনা তীরবর্তী জেলেদের জীবনেও এমন পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় উপকূলের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ নদীতে মাছ শিকারে যেত কুপি বাতির আলো জ্বালিয়ে। বাতাসে বাতি যেন নিভে না যায় সেজন্য তারা বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্য নিত। স্থানীয় ভাষায় এ পদ্ধতিতে আলো জ্বালানোকে বোম্বা বাতি বলা হয়। তাতেও জেলেদের রাতের বেলায় মাছ ধরাসহ প্রয়োজনীয় কাজ করতে অসুবিধা হতো। জেলেদের এমন অনেক সমস্যা সহজ হয়ে এসেছে প্রযুক্তির কল্যাণে।

জেলেদের হাতের নাগালে আসায় তারাও প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। বিকালের ক্লান্ত রোদ বিদায়ের পর ভাসমান নৌকায় জ্বলে ওঠে সৌরবিদ্যুতের বাতি। রাতে ইলিশ শিকারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, জাল মেরামত করা, নদীতে জাল ফেলা, জাল উঠানো, ইলিশ সংগ্রহ, রান্নার কাজ– সব কিছুতেই জেলেদের সঙ্গী সৌর বিদ্যুৎ। এক কথায় বদলে গেছে জেলেদের জীবন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

এক কোটি গাছের চারা বিতরণ হবে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আগামী ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সারা দেশে ৪৮২টি উপজেলায় এক কোটি গাছের চারা বিতরণ করবে সরকার। ১৩ই জানুয়ারি সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন একথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। ফলজ, বনজ ও ঔষধিসহ সকল প্রকার গাছের চারা বিতরণ করা হলেও দেশীয় ফলজ গাছকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন আরো বলেন, দেশের মানুষকে বিশুদ্ধ পরিবেশ উপহার দিতে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে।

বজ্রপাত রোধে ৩৮ লাখ তালের চারা রোপণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, বজ্রপাতের প্রভাব হ্রাসে দেশব্যাপী তালগাছের চারা রোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৮ লাখ তালগাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে ও (এসওডি) বজ্রপাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্র্যাক আয়োজিত বাংলাদেশে বজ্রপাতের ঝুঁকি ও করণীয় শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সুনামগঞ্জ সদরের লক্ষণশ্রী গুচ্ছগ্রামে তালগাছের চারা রোপণ করেন জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার হচ্ছে বজ্রপাতের ঝুঁকি ও জীবনহানি বৃদ্ধির কারণ নির্ণয়পূর্বক ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর পদক্ষেপ গ্রহণ, বজ্রপাতে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে এ সংক্রান্ত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্তকরণ, বজ্রপাতের আগাম বার্তা দিয়ে গবেষণা কার্যক্রম, আগাম সতর্কবার্তা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনগণকে অবহিতকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরি ও প্রদর্শন, ভ্রাম্যমাণ সিনেমা প্রদর্শন, সচেতনতামূলক গান তৈরি করে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো, বজ্রপাতে ক্ষতি হ্রাসে করণীয় বিষয়ে নির্দেশিকা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিল্ডিং কোডে বজ্রপাত বিষয়ে নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় বজ্রপাত বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

মহাসড়কে যানচলাচল সম্পর্কিত হাইকোর্টের নির্দেশনা

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী ব্যতীত অন্য কোনো সামগ্রী রাস্তার ওপর বা পার্শ্বে না রাখার নির্দেশনাসহ মহাসড়কে যানচলাচল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাইকোর্ট সম্প্রতি ২৫ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মহাসড়কে বা তার স্লোপে বা কোনো অংশে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে নির্মিত হাটবাজার বা দোকান উচ্ছেদ করার নির্দেশনার পাশাপাশি সড়ক বা মহাসড়কে বাঁক পরিহার করে যথাসম্ভব সোজাভাবে নির্মাণ বা সংস্কার করারও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সড়কে বাঁক থাকলে সামনে এ সংক্রান্ত সংকেত লিখিতভাবে থাকার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় আরো রয়েছে, যানবাহন চলাচল ছাড়া মহাসড়কে জনসভা বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না। রাস্তার পার্শ্বে পরিকল্পনা মাফিক বাস স্টপেজ স্থাপন করতে হবে। সড়ক-মহাসড়ক ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে গবাদিপশু পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত খোলা ট্রাক ও লরি ছাড়া সকল প্রকার খোলা ট্রাক ও লরি চলাচল বন্ধ থাকবে। মহাসড়কে গতিরোধক কমিয়ে আনতে হবে এবং গতিরোধকেও নিয়মিতভাবে উপযুক্ত রং ব্যবহার করতে হবে। যানজট কমানোর জন্য মহাসড়কে স্থান নির্ধারণ করে ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজ, ওভারপাস ও লেবেল ক্রসিং তৈরি করতে হবে।

নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্ঘটনার পর দ্রুত যানবাহন অপসারণের জন্য হাইওয়ে পুলিশকে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আরো কার্যক্রম চালাতে হবে। মহাসড়কে পথচারী পারাপারের জন্য উপযুক্ত ক্রসিং নির্ধারণ করে আন্ডারপাস ও ওভারপাস নির্মাণ হবে। যত্রতত্র রাস্তা পারাপার বন্ধে উঁচু লোহার রেলিং দিতে হবে। মহাসড়কে রোড ডিভাইডার দিতে হবে এবং দুর্ঘটনা-প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে গতিসীমা সীমিত রাখার জন্য রাস্তার পার্শ্বে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। মহাসড়কের ওপর চাপ কমানোর জন্য রেলপথ ও নৌপথের সুবিধা বাড়াতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গাড়ির মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওজন মাপার যন্ত্র স্থাপন করতে হবে। সড়ক-মহাসড়কে রাস্তার পার্শ্বে পর্যাপ্ত স্লোপ ও ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। চালকের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

গাজীপুর-বিমানবন্দর বিআরটিসির ১৬টি এসি বাস চালু

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের শিববাড়ি থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত বিআরটিসির ১৬টি এসি বাস সার্ভিসের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ২৫শে জানুয়ারি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ বাস সার্ভিসের উদ্‌বোধন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যুগ্মসচিব মো. আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসির) চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব এহসান এলাহী।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতু দৃশ্যমান ৩১৫০ মিটার

পদ্ম সেতুতে ২১ তম স্প্যান বসানো হয়েছে। শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ৩২ ও ৩৩ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যানটি বসানো হয়েছে। এ অবস্থায় সেতুর ৩ হাজার ১৫০ মিটার দৃশ্যমান হয়েছে। ১৪ই জানুয়ারি বেলা ৩টার দিকে সেতুর ৩২ ও ৩৩ নম্বর পিলারের ২১ তম স্প্যান ৬-বি বসানো হয়। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, দুপুর

৩টা ৩ মিটিটের সময় ৬-বি স্প্যান বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়। ২০তম স্প্যান বসানোর ১৪ দিন পর ২১ তম স্প্যান বসানো হলো। দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীদের চেষ্টায় সফলভাবেই স্প্যানটি বসানো সম্ভব হয়েছে। একের পর এক স্প্যান বসিয়ে এভাবেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে। পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে যাওয়ার স্বপ্নটি বাস্তবে রূপ নেবে আরো ২০টি স্প্যান বসিয়ে। জানা গেছে, সেতুর ৪২টি পিলারের মধ্যে ৩৬টি পিলারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৬টি পিলারের কাজ শেষ হতে পারে জুন মাসের মধ্যে। বর্তমানে মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে ১৩টি স্প্যান আছে। ২০টি স্প্যান পিলারের উপর উপর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৬টি স্প্যান চীনে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং ২টি স্প্যান মাওয়ার পথে আছে। জানুয়ারি মাসে সেতুতে ২টি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা আছে প্রকৌশলীদের।

বাংলাদেশ থেকে এক বাসেই ভারত যাতায়াত

বাংলাদেশ থেকে সড়কপথে এক বাসেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতীয় দৈনিক দ্য ইকোনমিক টাইমস্-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়,

১৬ই জানুয়ারি ঢাকা থেকে সরাসরি এ সেবা বাস চালু হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন এ সিদ্ধান্ত এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীমান্ত যাত্রীদের আর বাস পরিবর্তন করতে হবে না, যা আগে দরকার হতো বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এক বৈঠকে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্য ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সরকারি এক কর্মকর্তা বলেছেন, ঢাকা-শিলিগুলি-স্যাংটক (সিকিম)-ঢাকা এবং ঢাকা শিলিগুড়ি-দার্জিলিং-দার্জিলিং-ঢাকা রুটে পরীক্ষামূলক বাস চালুর পরিকল্পনা করেছে ঢাকা। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সড়কপথে ইতোমধ্যে যোগাযোগ থাকলেও সরাসরি যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। সীমান্তে বাস পরিবর্তন করতে হয় যাত্রীদের। তবে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যাত্রীদের সীমান্তে বাস পরিবর্তন করতে হবে না।

ঢাকা-পাটুরিয়ায় হচ্ছে রেলপথ

দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বল্প খরচে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবহণ সেবা দিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করে যাচ্ছে। রেলওয়ের মাস্টারপ্লানের আওতায় ঢাকা থেকে পাটুরিয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্ধারণ হবে। ১৪ই জানুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ফেনী-১ আসনের সংসদ সদস্য বেগম শিরীন আখতারের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজনের পক্ষে এ কথা জানান কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষে স্বাস্থ্য বিষয়ে ১২ মাসে ১২ কর্মসূচি

মুজিববর্ষ উপলক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ১২ মাসে ১২টি বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগামী মার্চে 'যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও সেবা মাস' পালনের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হবে। আর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ভাইরাল হেপাটাইটিস মাস' পালনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হবে। ১০ই জানুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতি মাসে একটি করে সেবা ও প্রচারণা মাস পালন করবে। এর মধ্যে রয়েছে– ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, দেশজ চিকিৎসা, পুষ্টি, জনকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, রোগী নিরাপত্তা, মানসিক স্বাস্থ্য, অসংক্রামক রোগ, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার।

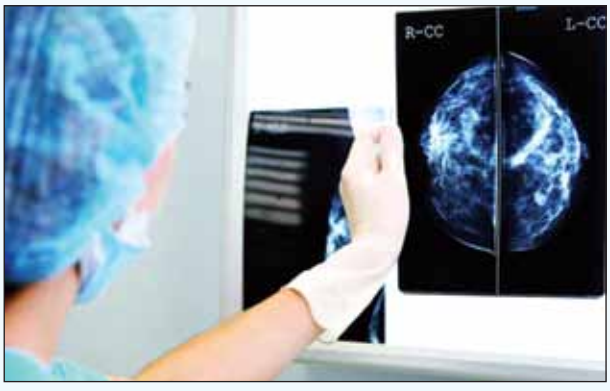

স্তন ক্যানসার শনাক্ত করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বিশেষজ্ঞ রেডিওলজিস্টদের মতোই এখন স্তন ক্যানসার শনাক্ত করতে পারবে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি। ১লা জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের একদল গবেষকের গবেষণার এ তথ্য নেচার জার্নালে প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

এআই সিস্টেমটিকে প্রশিক্ষণ দিতে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ ও ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত এ দলটি কয়েক হাজার ম্যামোগ্রামের প্রতিবেদন ইনপুট দেয়। এরপর তারা যুক্তরাজ্য থেকে ২৫৮৫৬ এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩০৯৭ সেট ম্যামোগ্রাম থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে এআই সিস্টেমের ফলাফলের তুলনা করে দেখে। এতে দেখা যায়, এআই সিস্টেমটি বিশেষজ্ঞ রেডিওলজিস্টদের মতোই একই ধরনের নির্ভুলভাবে স্তন ক্যানসার শনাক্ত করতে পারে।

শিশুদের খাওয়ানো হয়েছে ভিটামিন এ

সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সারা দেশে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ১১ই জানুয়ারি ঢাকা শিশু হাসপাতালে শিশুদের ক্যাপসুল খাইয়ে এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

দেশের ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী কেন্দ্রে ও ২০ হাজার অস্থায়ী কেন্দ্রে শিশুদের টিকা খাওয়ানো হয়। ৫-১১ মাস বয়সি শিশুদের একটি করে নীল রঙের ও ১২-৫৯ মাস বয়সি শিশুদের একটি করে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। সরকারি-বেসরকারি প্রায় তিন লাখ স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দুই কোটির বেশি শিশুকে এ ক্যাপসুল খাওয়ান।

চালকদের চোখের রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা

এখন থেকে যানবাহনের চালকদের চোখের সমস্যার বিনামূল্যে চিকিৎসা দিবে 'স্প্লেন্ডর লো ভিশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি মিরপুর ৬ নম্বরে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

এনআইএমএস ওয়েবসাইট ও মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন উদ্‌বোধন

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের প্রধান কার্যালয়ে ১২ই জানুয়ারি নার্কোটিকস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এনআইএমএস) ওয়েবসাইট ও মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর ও কোরিয়ার সহযোগিতায় তৈরি নার্কোটিকস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপনের উদ্‌বোধন করেন।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজনীতিবিদ কিংবা জনপ্রতিনিধি যেই হোন, অন্যায় করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী শুধু মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেননি, সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। আর যারা

মাদক বিক্রি করে, অন্যায়ভাবে টাকা উপার্জন করেন, তারা সেটিই অন্যায়ভাবেই ব্যয় করেন। তিনি বলেন, মাদক এমন একটি নেশা, যা সমাজকে ধ্বংস করে। এনআইএমএসের মধ্যে দিয়ে এখন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারবে। অধিদফতরের কর্মকর্তারা আগে যেসব কাজ করতেন, তার আধুনিকায়ন করতেই এনআইএমএস চালু করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ২রা জানুয়ারি ২০২০ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ২রা জানুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের (ডিএনসি) ৩০তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, এরপর বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এবারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'মাদককে রুখবো, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বো'।

মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় তিনি বলেন, আমরা ১০ই জানুয়ারি থেকে কাউন্টডাউনের মাধ্যমে মুজিববর্ষ পালন করব। প্রধানমন্ত্রীর মাদকবিরোধী জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুবসমাজকে এমনকি নতুন প্রজন্মকে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন করব। উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে হলে যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে হবে। আমরা যদি সবাই মিলে কাজ করি তাহলে ২০৪১ সালে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবো। মাদক ব্যবসায়ীরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমার একটি রুট হিসেবে ব্যবহার করে। যা আমি ব্যক্তিগতভাবে রুট বন্ধের জন্য আলোচনা করছি। কিন্তু যতবারই কথা বলেছি, মিয়ানমার ততবারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা ইয়াবা বন্ধের বিষয়টি দেখবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, মাদক নির্মূলে আমরা তিনভাবে কাজ করেছি। ডিমান্ড ও সাপ্লাই হ্রাস এবং সর্বোপরি মাদকাসক্তদের পুনরায় কর্মদক্ষ করতে নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে। কারাগারের ৮০ হাজারের ওপর বন্দি রয়েছে। যার বেশিরভাগই মাদকের আসামি। মাদক মামলা নিষ্পত্তির জন্য আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ২০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। আমরা এমন আরো হাসপাতাল তৈরি করবো। বর্তমানে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র ৩২৪টি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আমরা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সংশোধন করছি।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুদের মেধাশক্তি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে

শিশুদের সারাক্ষণ শুধু পড়ার জন্য চাপ না দিয়ে তাদের ভেতরের মেধা ও শক্তি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টিতে নজর দিতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিশুর ভেতরে যে একটা মেধা থাকে, একটা শক্তি থাকে– এই জিনিসটা যেন বিকশিত হতে পারে, সেটা যেন ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারে দেশের জন্য। কাজেই সারাদিন বই পড়ে পড়ে সময় কাটানো না। বেশি পড় পড় করলে কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করে না, মনটা খারাপ হয়ে যায়। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কাজেই খেলাধুলার মধ্য দিয়েই পড়াশোনা। নিজের গরজে পড়বে, একা একা পড়বে।

কন্যাশিশুদের প্রতিবাদ করতে শেখাবে 'শাহানা কার্টুন'

'শাহানা কার্টুন'-এর শাহানা একজন প্রতিবাদী মেয়ে। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে যৌন হয়রানি, যৌতুক, বাল্যবিবাহসহ অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজগুলোর বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিবাদ করতে হয় তা দেখানো হয়েছে শাহানা কার্টুনে। মেয়েশিশুদের অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলতে এবার স্কুলে স্কুলে দেখানো হবে শাহানা কার্টুন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ গণভবনের আঙিনায় শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খেলাধুলায় অংশ নেন–পিআইডি

রাজধানীর কলাবাগানে লেক সার্কাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ১১ই জানুয়ারি শ্রেণিকক্ষে শাহানা কার্টুন প্রদর্শনের উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। a2i-Access Information নামের ফেসবুক পেজে নমুনা ক্লাসের লাইভ সম্প্রচার করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে বলেন, এই শাহানা কার্টুনের মাধ্যমে আমরা দেখছি সে কীভাবে প্রতিবাদ করে শাহানা কার্টুনের গল্পে বলা আছে, লজ্জার কিছু নেই তোমরাও লজ্জা পাবে না। কারণ যে উত্যক্ত করবে সে অপরাধী। তাই লজ্জা তার পাওয়া উচিত। যৌন হয়রানিমূলক যা ঘটবে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে পরিবারকে জানাবে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২০

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতির ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় ২১দিন ব্যাপী বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২০। দেশের ৬৪টি জেলা-উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পীর অংশগ্রহণে সরগরম হয়ে উঠে শিল্পকলা একাডেমির নন্দন মঞ্চ। দ্বিতীয়বারের মতো এ উৎসবের আয়োজন করে শিল্পকলা একাডেমি। ৩রা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২১ দিনব্যাপী এ উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছিল ঐতিহ্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও নান্দনিক পরিবেশনা। উৎসবের উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি সচিব মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির সচিব মো. বদরুল আলম ভুঁইয়া।

কালি ও কলম পুরস্কার

কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা সাহিত্যের জন্য পুরস্কার পেলেন চার তরুণ কবি ও লেখক। ৪ঠা জানুয়ারি ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে আয়োজন করা হয় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের দ্বাদশ কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার ২০১৯। এ বছর 'জলপরীদের দ্বীপে' কাব্যগ্রন্থের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন হানযালা হান। কথাসাহিত্যের 'লালবেজি' গল্পগ্রন্থের জন্য পেয়েছেন কামরুন নাহার শীলা। প্রবন্ধ, গবেষণা ও নাটক শাখায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম। 'মহাজীবনের প্রতিকৃতি' বইটির জন্য ফয়সাল আহমেদ ও মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিকিৎসা সহায়তা বইটির জন্য চৌধুরী শহীদ কাদের। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে দেওয়া হয় ১ লাখ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ।

কামরুল হাসান প্রদর্শন শাখায় এ অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি ছিলেন নাট্যজন আসাদুজ্জামান নূর ও শিল্পী রফিকুন নবী।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

রাজধানীর হাতিরঝিলে এমফি থিয়েটারে ১১ই জানুয়ারি আতশবাজি ও বর্ণিল আনন্দ উৎসব করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীকে স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠান থেকে একযোগে

হাতিরঝিলে এমফি থিয়েটারে ১১ই জানুয়ারি আতশবাজি ও বর্ণিল আনন্দ উৎসব

বাংলাদেশের সব উপজেলায় কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসব পালন ও বর্ণিল আতশবাজি করা হয়। এ উৎসবের আয়োজন করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের উপস্থিতিতে প্রদর্শিত হয় বর্ণিল আলোকসজ্জা, আতশবাজি। আতশবাজির উজ্জ্বল আলোয় পুরো হাতিরঝিল আলোকিত হয়ে উঠে। চমৎকার দৃষ্টিনন্দন এ আতশবাজি উপভোগ করেন শত শত দর্শক। আতশবাজি শেষে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। তুলে ধরা হয় দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতির নানা চিত্র। পরে নৃত্য পরিবেশন করেন দেশের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীরা।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ– এই স্লোগানে রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত অষ্টাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসব ১১ থেকে ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ১১ই জানুয়ারি রাজধানীর জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে উৎসবের উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। এ উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন এশিয়ান প্রতিযোগিতা বিভাগের জুরি জোয়ানা কস ক্রাউজে এবং উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল। আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রদর্শন করা হয় এবারের উৎসবের উদ্‌বোধনী চলচ্চিত্র 'উইন্ডো টু দ্য সি'। স্পেন ও গ্রিসের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এ চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল জিমেনেজ।

এবারের উৎসবে এশিয়ান প্রতিযোগিতা বিভাগ, রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগ, বাংলাদেশ প্যানারোমা সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিল্ড্রেন্স ফিল্ম, স্পিরিচুয়াল ফিল্ম, ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম এবং উইমেন্স ফিল্ম সেশনে বাংলাদেশসহ ৭৪টি দেশের মোট ২২০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। রাজধানীর কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন ও প্রধান মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা ও নৃত্যশালা মিলনায়তন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তন, মধুমিতা সিনেমা হল ও স্টার সিনেপ্লেক্সে প্রদর্শিত হয় চলচ্চিত্রগুলো। এ উৎসব চলাকালে ৭৪টি দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার, সমালোচক, সাংবাদিক, বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তা, রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ এবং অন্যান্য চলচ্চিত্র সংসদের সদস্যসহ দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা উৎসবে অংশ নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

উৎসবের অংশ হিসেবে ১২ ও ১৩ই জানুয়ারি চলচ্চিত্রে নারীর ভূমিকা বিষয়ক ষষ্ঠ ঢাকা আন্তর্জাতিক উইমেন ফিল্ম মোকারস্ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা ক্লাবের ২য় তলায় এই কনফারেন্সটি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এছাড়া উৎসবের অংশ হিসেবে ১৪ই জানুয়ারি দিনব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে দেশীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকারদের ভাবনার মিথস্ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান ওয়েস্ট মিটস ইস্ট। ১৯শে জানুয়ারি এ উৎসবের পর্দা নামে।

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামীর স্বপ্ন' স্লোগানে চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের উদ্যোগে ২৪শে জানুয়ারি ৮ দিনব্যাপী ১৩তম 'আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ১৯শে জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় জাদুঘরে অষ্টাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

উৎসবটির দ্বিতীয় দিন ২৫শে জানুয়ারি ১১টায়, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান মিলনায়তনে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী, দুপুর ২টায়, সেন্ট গ্রেগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫০ জন শিক্ষার্থী বিনামূল্যে দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র উপভোগ করেন।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে সকাল ১১টায় ক্ষুদে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সিনেমাটোগ্রাফী বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন সিনেমাটোগ্রাফার নেহাল কুরাইশি এবং সন্ধ্যা ৬টায় বিশেষ অধিবেশন কর্মশালা পরিচালনা করেন মনোবিশেষজ্ঞ অ্যান্নী বারোই। ২৬শে জানুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি শওকত ওসমান মিলনায়তনে, সকাল ১১টায়, দুপুর ২টায়, বিকাল ৪টায় ও সন্ধ্যা ৬টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। সকাল ১১টায় জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে শিশু-কিশোর চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা পিপলু আর খান।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবানে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের উদ্‌বোধন

বান্দরবানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। ১৩ই জানুয়ারি বান্দরবান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে জেলা স্টেডিয়ামে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়। এবারের টুর্নামেন্টে বালক এবং বালিকা মিলে ৭টি দল অংশ নেয় এবং ১৫ই জানুয়ারি টুর্নামেন্টের সমাপনী খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বান্দরবান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ সিদ্দীকুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০' উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ১১ই জানুয়ারি কাপ্তাই কর্ণফুলি সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে উৎসবের শুভ সূচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক। পাহাড়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে ভূমিকা রাখবে এ উৎসব।

এসময় মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, 'মুজিববর্ষ আমরা বিভিন্নভাবে উদ্‌যাপন করছি। দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হওয়া বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব' নতুন মাত্রা যোগ করল। এটা পর্যটন বিকাশেও ভূমিকা রাখবে। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশে প্রথমবারের মতো এ উৎসবের আয়োজন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। ১১ থেকে ১৫ই জানুয়ারি পাঁচ দিনব্যাপী তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে উৎসবটি চলবে। ২৭ জন নারীসহ এ উৎসবে ১০০ জন অ্যাডভেঞ্চারার অংশগ্রহণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্‌বোধন

রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস খাওয়ানোর মাধ্যমে ১১ই জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করেন রাঙামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কৃষ কেতু চাকমা। ২য় রাউন্ডে রাঙামাটি জেলায় মোট ৭৯ হাজার ৪৪৬ জন শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২য় রাউন্ডে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি শিশু খাবে নয় হাজার ২৯টি ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশু খাবে ৭০ হাজার ৪১৭টি ক্যাপসুল। পুরো জেলায় মোট ১ হাজার ৩১৫টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিপিএলের নতুন চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী রয়েলস। বঙ্গবন্ধু বিপিএলের ফাইনালে মুশফিকুর রহিমের নেতৃত্বাধীন খুলনা টাইগারর্সকে ২১ রানে হারিয়ে বিপিএলের প্রথম শিরোপা ঘরে তুলেছে রাজশাহী। এর আগে ২০১৬ সালে বিপিএল ফাইনালে উঠেও ঢাকা ডায়নামাইটের বিপক্ষে হেরে শিরোপ বঞ্চিত হয়েছিল রাজশাহী। তবে এবার আর হতাশ হতে হয়নি। সপ্তম আসরের শিরোপা নিয়েই বাড়ি ফিরেছে আন্দ্রে রাসেলের নেতৃত্বাধীন দলটি।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক ১১ই জানুয়ারি কাপ্তাই কর্ণফুলি সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০' উদ্‌বোধন করেন

১৭ই জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৭০ রানের চ্যালেঞ্জিং

স্কোর গড়ে রাজশাহী রয়েলস। এরপর ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রানে ইনিংস শেষ হয়।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের উড়ন্ত সূচনা

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে উড়িয়ে যুব বিশ্বকাপে উড়ন্ত সূচনা করল আকবর আলী, তৌহিদ হৃদয়রা। ১৮ই জানুয়ারি পচেফস্ট্রুম জিম্বাবুয়ে দলকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী টসে জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাটিংয়ে পাঠান। জিম্বাবুয়ের ইনিংসে বৃষ্টি বাগড়া দেয় একাধিকবার। ২৮.১ ওভারে দলটা ৬ উইকেটে ১৩৭ রান করার পর যে বৃষ্টি নামে, সেটা স্থায়ী হয় দীর্ঘক্ষণ। ফলে জিম্বাবুয়ের আর ব্যাট করা হয়নি।

বৃষ্টি থামার পর ডাকওয়ার্থ লুইস মেথডে বাংলাদেশের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ হয় তা ছিল বেশ কঠিন। জয় পেতে ২২ ওভারে ১৩০ রান করতে হতো আকবর আলীদের। রভেজা আউটফিল্ডে এই লক্ষ্য কঠিনই। কিন্তু পারভেজ হোসেন ইমনের ঝোড়ো ফিফটির সঙ্গে তানজিদ হাসান ও মাহমুদুল হাসান জয়ের ব্যাটিং ঝড়ে মাত্র ১০.৫ ওভারে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।

বর্ষসেরা ওয়ানডে ব্যাটিংয়ে সাকিবের বিশ্বকাপের সেই সেঞ্চুরি

২০১৯ সালটা স্বপ্নের মতো কাটিয়েছেন বাংলাদেশ দলের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। বিশেষ করে বিশ্বকাপে নজর কাড়া পারফরম্যান্সে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টের ৮ ম্যাচে ৫ ফিফটি ও ২ সেঞ্চুরিতে প্রায় ৮৭ গড়ে ৬০৬ রান করেছিলেন সাকিব। যে ম্যাচে ফিফটি পেরুতে পারেননি, সেটিতেও করেছিলেন ৪১ রান। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন সাকিব। তার এমন সাফল্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাকে বর্ষসেরা ওয়ানডে পারফরম্যান্সের পুরস্কার দিয়েছে। এমনকি ঐতিহ্যবাহী উইজডেন সাময়িকীও তাকে দশক সেরা ওয়ানডে দলে রাখে। এবার ক্রিকেটের সবচেয়ে বড়ো নিউজি পোর্টাল ক্রিকইনফো গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ সালের ১০টি ব্যাটিং পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করেছে। যেখানে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সাকিবের ১২৪ রানের অপরাজিত ইনিংসটিও আছে। সাকিবের ইনিংসের পারফরম্যান্স নিয়ে ক্রিকইনফো লিখে, তিন নাম্বারে ব্যাটিংয়ে নেমে সাকিব বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করে। যেখানে বাংলাদেশ রান তাড়া করতে নেমে সবচেয়ে বড়ো জয় পায়।

লিগ পর্ব শেষে সেরা বোলার মুস্তাফিজ

শেষ হলো বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ডাবল লিগ পদ্ধতির মোট ৪২টি ম্যাচ। ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত এই ম্যাচগুলোতে ব্যাটসম্যান-বোলারদের তীব্র লড়াই দেখেছে ক্রিকেটপ্রেমিরা। লিগ পর্ব শেষে বোলারদের মধ্যে সেরার খেতাবটা পেয়ে গেছেন রংপুর রেঞ্জার্সের বাঁ-হাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমান। ১২ ইনিংসে ২০ উইকেট শিকার করেছেন তিনি।

ছয় ডিসিপ্লিনে সোনার হাসিতে শেষ বাংলাদেশের

২৫টি ডিসিপ্লিনে ৪৬২ জন অ্যাথলেট নিয়ে নেপালে নোঙর ফেলেছিল বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে নিজেদের ইতিহাসের সেরা সাফল্য ১৯টি সোনার পদক নিয়ে কাঠমাণ্ডু-পোখারার আসর শেষ করার তৃপ্তি আছে। আছে আর্চারির দশ ইভেন্টের সবগুলোয় সোনা জয়ের কীর্তি। ভারোত্তোলনে ছাপিয়ে গেছে গতবারের সাফল্য। চমক দেখিয়েছে কারাতে, তায়কোয়ান্দো, ফেন্সিং।

প্রতিবেদন: মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

চলে গেলেন ভাষা সৈনিক চিকিৎসক এম এ হামিদ খান

আফরোজা রুমা

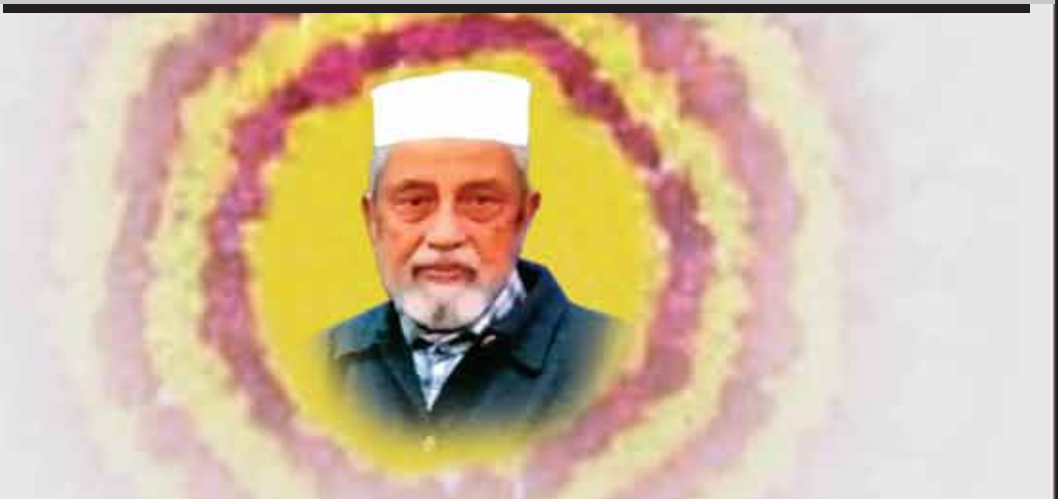

চলে গেলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম শহিদমিনার প্রতিষ্ঠাতা, ভাষা সৈনিক প্রবীণ চিকিৎসক ও নেত্রকোনা ডায়াবেটিস সমিতির সভাপতি ডা. এম এ হামিদ খান। ২৫শে জানুয়ারি শারীরিক অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ায় তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত দেড়টায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

এম এ হামিদ খান ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার বৈরাটি ইউনিয়নের মাথাং গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আলী নেওয়াজ খান ও মাতা জাহেদা খাতুনের দুই ছেলে সন্তানের মধ্যে তিনি বড়ো ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবা আর ছয় বছর বয়সে মাকে হারাতে হয়েছে তাঁর। পরিবারের অভিভাবক হন চাচাতো বড়ো ভাই আবদুল লতিফ। তাঁর অনুপ্রেরণায় নিজ গ্রামের একটি মক্তবে ভর্তি হন তিনি। সেখানেই শুরু হয় তাঁর হাতেখড়ি। পরে ভর্তি হন পাশের গ্রামের তেনুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে জেলা শহরের আঞ্জুমান আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞান শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাস করেন তিনি। তারপর ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তখনকার পূর্ববঙ্গের একমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এমবিবিএস পাস করেন। তিনি নেত্রকোনা জেলার তৃতীয় এমবিবিএস চিকিৎসক ছিলেন।

এম এ হামিদ খান ১৯৬৯ সালে নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক এএফএম সায়েদুল্লাহর মেয়ে লুৎফুরন্নাহার পারভীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হামিদ খানের একমাত্র ছেলে শামীম রেজা খান মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিন মেয়ে নীলুফার রুবা, সিফা নুসরাত রুপো ও সারিকা নুজহাত রিমু উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। এদের মধ্যে সবার ছোটো মেয়ে সারিকা নুজহাত রিমু বাবার মতো চিকিৎসক ছিলেন।

এম এ হামিদ খান মেডিকেলে অধ্যয়নকালে ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে মিছিলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ছিলেন সেই একই মিছিলে অকুতোভয় এম এ হামিদও ছিলেন।

১৯৫৫ সালে প্রলয়ংকরী বন্যায় ঢাকা থেকে নেত্রকোনায় প্রেরিত মেডিকেল টিমের নেতৃত্ব দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত চিকিৎসক প্রিন্সিপাল মোফাখারুল ইসলামের মতো প্রতিথযশা চিকিৎসক। ১৯৫৮ সালে যখন সারা দেশে কলেরা ও গুটি বসন্তের মতো রোগ ভয়াবহ এবং মহামারী আকার ধারণ করেছিল, তখন হামিদ খান নেত্রকোনায় চিকিৎসক সহায়তা প্রদানের জন্য ইমারজেন্সি হেলথ অফিসার হয়ে সেবা প্রদান করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছিলেন তিনি। কলেরা ও গুটি বসন্তের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে সেখান থেকেই তাঁর উপলব্ধি হয় বঞ্চিত মানুষদের পাশে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। আর সেজন্যই সরকারি চাকরি, বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও অবস্থান সব কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি নেত্রকোনার মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। চিকিৎসার পাশাপাশি শিশু-কিশোর সংগঠন থেকে শুরু করে শিক্ষা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনেও তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

এম এ হামিদ খান অসংখ্য পদক, সংবর্ধনা ও সম্মাননা লাভ করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– কলকাতার নেত্রকোনা সম্মিলনী তাঁকে ২০০৭ সালে সংবর্ধনা, নেত্রকোনা জেলা প্রেস ক্লাব সম্মাননা, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ সম্মাননা, মানবাধিকার নাট্য পরিষদ সম্মাননা। মানবতাসেবা ও সত্যের উপাসনায় নিয়োজিত চিকিৎসক এম এ হামিদ খানকে ২৬শে জানুয়ারি দুপুর আড়াইটার দিকে নেত্রকোনা স্টেডিয়ামে জানাজা শেষে তাঁর গ্রামের বাড়ি পূর্বধলায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 08, February 2020, Tk. 25.00

বসন্ত বরণ ১৪২৬

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd